সোনার পরশ

৭৩
২৫.৫.৭০

কালিদাস রায়

সোনার পরশ

কবিশেখর কালিদাস রায়, 'দেশিকোত্তম'

সঞ্জীব প্রকাশন
১৪, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রকাশক :
সঞ্জীব ভট্টশালী, বি, কম
১০৭, কেশব চন্দ্র সেন স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

3.7.06
12198

নূতন সংস্করণ—১৯৮৯

মূল্য : দশ টাকা মাত্র

মুদ্রাকর :
কালিকা প্রেস (প্রাঃ) লিমিটেড
২৫, ডি. এল. রায় স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৬

সূচীপত্র

ব্যাধের মোহমুক্তি	:	১
সোনার পরশ	:	৭
আধসের বুকের মাংস	:	১১
দৈবের নিবন্ধ	:	১৭
জাপানী গল্প	:	২১
অদ্ভুত লক্ষ্যভেদ	:	২৫
নিয়তির খেলা	:	২৯
যেমন কর্ম তেমনি ফল	:	৩৫
ভক্তের ভগবান	:	৪১
তৃষ্ণা	:	৪৭
লোভের পরিণাম	:	৫৪
চণ্ডালপুত্র	:	৫৯
বেতালের কথা	:	৬৫
তীর্থ দর্শন	:	৭১
কবির ভাগ্য	:	৭৭
দেশরক্ষা	:	৮৩
বৃক্ষের সাক্ষ্য	:	৮৬

ব্যাধের মোহমুক্তি

ব্রহ্মদত্তের রাজত্বকালে বোধিসত্ত্ব একবার হিমবন্ত প্রদেশে এক মৃগরাজের মহিষীর গর্ভে সুবর্ণমৃগরূপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার নাম ছিল রোহন্ত। তাঁহার ভ্রাতার নাম ছিল চিত্র ও ভগিনীর নাম সুতনা।

এক ব্যাধ একবার শিকার করিতে গিয়া রোহন্তকে দেখিতে পায়। কিন্তু বহু চেষ্টা করিয়াও ধরিতে পারে নাই। সে প্রতিবৎসর শরতকালে হিমালয় যাত্রা করিত, কিন্তু রোহন্তকে ধরিতে পারিত না। শেষে সে তাহার পুত্রকে স্বর্ণমৃগের সন্ধান দিয়া দেহত্যাগ করিল।

কাশীরাজের মহিষী ক্ষেমা স্বপ্নে স্বর্ণমৃগ দেখিয়া উহা পাইবার জন্য পাগল হইলেন। তিনি ছিলেন গর্ভবতী। গর্ভাবস্থায় সাধ মিটানো উচিত। রাজা ঘোষণা করিয়া দিলেন—যে স্বর্ণ-মৃগ ধরিয়া আনিবে সে লক্ষ সুবর্ণমুদ্রা পুরস্কার পাইবে। ব্যাধ-পুত্র ঘোষণা শুনিয়া রাজার কাছে আসিয়া বলিল—"মহারাজ, আমি স্বর্ণমৃগের সন্ধান জানি, তবে জীবিত অবস্থায় আনতে পারব কি-না জানি না।"

ব্যাধ হিমবন্ত প্রদেশে যাত্রা করিয়া অনেক সন্ধানের পর দুরারোহ পর্বত-শিখরে রোহন্ত মৃগকে অসংখ্য মৃগের মধ্যে নক্ষত্রবেষ্টিত চন্দ্রের মত দেখিতে পাইল। ব্যাধ লক্ষ্য করিল—নীচে ঝরণার জল পান করিতে তাহারা নামে। ইহা দেখিয়া সে ঝরণার ধারে ফাঁদ পাতিয়া রাখিল।

মৃগরাজ রোহন্ত অনুচরগণসহ জল পান করিতে নামিলেন। তিনি দলের আগে-আগে যাইতেন, কাজেই ফাঁদে তাঁহারই পা পড়িল। বন্দী হইয়া রোহন্ত অনুচরগণকে সাবধান করিয়া দিলেন, অনুচরগণও ভয়ে পলায়ন করিল। কেবল চিত্র ও সুতনা ভ্রাতাকে বন্দী দেখিয়া পলাইল না।

রোহন্ত বলিলেন—"আমি বন্দী হলাম ; তোমরা মিছামিছি প্রাণ দেবে কেন ? তোমরা চলে যাও।"

চিত্র ও সুতনা কিছুতেই গেল না। তাহারা বলিল—"দাদা, আপনার যে গতি আমাদেরও সেই গতি। আপনাকে বিপন্ন করে আমরা তুচ্ছ জীবন বাঁচাতে চাই না। তা ছাড়া, আপনাকে বাঁচাতে পারি কিনা তারও তো চেষ্টা করতে হবে।"

রোহন্ত বলিলেন—"দেখ, আমাকে ফিরাতে পারবে না। কোন ব্যাধ অর্থলোভে আমাকে ধরতে এসেছে। আমাকে নিয়ে কোন রাজা বা রাজপুরুষকে উপহার দেবে, আমি চির বন্দী হয়েই থাকব। তোমাদের বধ করে ব্যাধ আহারের জন্য পাথেয় করে নেবে। অতএব তোমাদেরও প্রাণহানি অনিবার্য।"

চিত্র ও সুতনা বলিল—"আমাদের প্রাণ যায় যাক, আমরা আপনাকে ফেলে ফিরব না।"

এমন সময়ে ব্যাধ লগুড়হস্তে নিকটবর্তী হইল। ব্যাধকে দেখিয়া সুতনা প্রাণভয়ে কিছুদূর পলাইল, কিন্তু পরে আবার ফিরিয়া আসিয়া ভ্রাতার গা ঘেঁষিয়া দাঁড়াইল। ব্যাধ এই দৃশ্য দেখিয়া অবাক হইয়া গেল।

সে স্বর্ণমৃগকে বলিল—"মৃগরাজ, তুমি বদ্ধ, কিন্তু এই দুটি মৃগ মুক্ত, এরা কেন পালাচ্ছে না ?"

রোহন্ত—এদের একজন আমার ভাই, আর একজন বোন। এরা আমাকে বিপন্ন অবস্থায় ফেলে পালাতে চাইছে না। আমার সঙ্গে প্রাণ দেবে বলে দাঁড়িয়ে আছে।

ব্যাধ এই কথা শুনিয়া অবাক হইয়া গেল। ইতরজীবের হৃদয়ে এত ভ্রাতৃপ্রেম! ব্যাধের পাষাণ প্রাণও বিগলিত হইল।

চিত্র—ব্যাধ, তুমি জান না, এই মৃগ সাধারণ মৃগ ন'ন, ইনি দশ সহস্র মৃগের অধিরাজ। এঁর মৈত্রী, করুণা, দয়া ও মহত্ত্বের তুলনা নেই। মহাপুরুষের যে-যে গুণ থাকার কথা, এঁর সেই-সেই গুণ সবই আছে। আমাদের জরাজীর্ণ মাতা-পিতার ইনি প্রতিপালক। এঁর মুখে ধর্মোপদেশ শুনলে তুমি অবাক হয়ে যাবে।

ব্যাধ ভাবিল—রাজার দত্ত পুরস্কার পাইয়া আমি ধনী হইতে পারি, কিন্তু এই মহামৃগকে বন্দী করিলে হয়ত আমার সর্বনাশ ঘটিবে। কাজ নাই পুরস্কারে, আমার চৌদ্দপুরুষ দরিদ্র ছিল—আমিও এতকাল দারিদ্র্যেই কাটাইলাম, সহসা ধনী হইয়া উঠিলে আমার মঙ্গল হইবে বলিয়া মনে হয় না।

এই ভাবিয়া ব্যাধ রোহন্তকে মুক্তি দিল।

চিত্র—নিষাদ, আজ তুমি আমার ভ্রাতাকে মুক্তি দিয়ে যে আনন্দ দান করলে সেই আনন্দ তুমি সপরিবারে যাবজ্জীবন ভোগ কর।

ব্যাধ—মৃগরাজ, তোমাদের দুজনের ভ্রাতৃপ্রেম আমাকে মুগ্ধ করেছে। মানুষের মধ্যে এমনটি তো কখনও দেখি নি।

রোহন্ত—ব্যাধরাজ, তুমি যে আমাকে ধরেছিলে, তা তোমার নিজের প্রয়োজনে, না, অন্য কারও প্রয়োজনে?

ব্যাধ—আমার নিজের কোন প্রয়োজনই ছিল না। মহারাণী ক্ষেমা স্বপ্ন দেখেছিলেন যে, আপনি তাঁকে ধর্মোপদেশ দিচ্ছেন। মহারাণী গর্ভবতী আছেন, তাই মহারাজ তাঁর বাসনাপূরণের জন্য ব্যগ্র হয়ে পুরস্কার ঘোষণা করেছিলেন। আমি আমার পিতার কাছে আপনার সন্ধান পেয়েছিলাম। সেই পুরস্কারের লোভে আমি ধরতে এসেছিলাম।

রোহন্ত—তাই যদি হয়, তবে তুমি আমাকে ছেড়ে দিও না, আমাকে নিয়ে চল। তোমার পুরস্কার লাভ হোক, মহারাণীর দোহদ-বাসনার পরিতৃপ্তি ঘটুক।

ব্যাধ—না মৃগোত্তম, রাজারা বড় নিষ্ঠুর-প্রকৃতি। সেখানে গেলে আপনার কি বিপদ হবে কে জানে?

রোহন্ত—তবে এক কাজ কর, তুমি আমার গায়ে হাত বুলোও, তা হলে সোনার লোম কতকগুলি আমার পিঠ হতে ঝড়ে পড়বে। সেই সোনার লোমগুলি রাজাকে দেখাবে এবং বলবে আমি সুবর্ণমৃগ ধরতে পেরেছিলাম, কিন্তু আনতে পারলাম না। তিনি কতকগুলি গাথা শিখিয়ে দিয়েছেন। সেই গাথাগুলি বললেই রাণীর সাধ মিটে যাবে।

ব্যাধ অনেকগুলি স্বর্ণলোম ঐ ভাবে সংগ্রহ করিল। রোহন্ত তখন ব্যাধকে আদর্শ রাজধর্ম সম্বন্ধে কতকগুলি গাথা শিখাইয়া দিলেন।

ব্যাধ রোহন্তকে প্রণাম করিয়া বারাণসীতে ফিরিয়া আসিল এবং রাজার সভায় উপস্থিত হইল।

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন—কি হে ব্যাধ, মৃগ কই?

ব্যাধ—মৃগ আনতে পারলাম না।

রাজা—কেন পারলে না ? তার দেখা পেয়েছিলে ?

ব্যাধ—হ্যাঁ মহারাজ, তাকে পাশবদ্ধও করেছিলাম।

রাজা—বল কি, পাশবদ্ধ করেও আনতে পারলে না।

ব্যাধ—সুবর্ণ মৃগ পাশবদ্ধ হলে তার অনুচরগণ সকলেই দিগ্‌বিদিকে পালাল। কেবল মৃগরাজের ভ্রাতা ও ভগিনী সেখানে দাঁড়িয়ে থাকল। তারা বলল যে, ব্যাধ, আমাদের বধ করে দাদাকে নিয়ে যাও। ইতরপ্রাণীর অদ্ভুত ভ্রাতৃভক্তি দেখে আমার মন গলে গেল। শুনলাম ঐ সুবর্ণমৃগ একজন স্বর্গভ্রষ্ট দেবতা, তাঁর চরিত্র ও আচরণের কথা শুনে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। তাঁর মুখের কথাও অমৃতোপম। তাঁর কথা শুনে আমার চিত্ত মৈত্রীভাবে পূর্ণ হয়ে গেল। আমি তাঁকে বন্ধনমুক্ত করলাম। মৃগরাজ আমাকে বন্ধন করার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। আমি সব কথা বললাম। তাতে তিনি বললেন—'তবে আমাকে রাজপুরীতে নিয়ে চল।' আমি তাতেও তাঁকে আনতে সম্মত হলাম না। আমি বললাম যে, আমার পুরস্কারে কাজ নেই।

এই কথা শুনে মৃগরাজ বললেন যে, তবে আমার গায়ে হাত বুলিয়ে কতকগুলি স্বর্ণলোম সংগ্রহ কর—রাজাকে দেখাও এবং আমি যে গাথা কয়টি শিখিয়ে দিচ্ছি তাই আমার প্রতিনিধি হয়ে সেখানে বিবৃত কর। তাতেই মহারাণীর দোহদতৃষ্ণা নিবারিত হবে।

এই বলিয়া ব্যাধ সুবর্ণ লোমগুলি রাজার হস্তে দিল। রাজা পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন—সেগুলি খাঁটি সোনারই বটে।

তারপর মহারাজ ব্যাধকে রত্নখচিত পালঙ্কে বসাইলেন এবং

নিজে ও মহারাণী ক্ষেমা কৃতাঞ্জলি হইয়া গৃহতলে বসিলেন। ব্যাধ রোহন্তের গাথাগুলি সেখানে ব্যাখ্যা করিতে লাগিল। রোহন্ত ব্যাধের দেহমনে নিজের শক্তি সঞ্চারিত করিয়াছিলেন। ব্যাধের ধর্মব্যাখ্যায় রাজা, রাণী ও রাজভবনের সমস্ত লোক অবাক হইয়া গেলেন। সকলে মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া শুনিতে লাগিলেন। মহারাণীর দোহদতৃষ্ণা নিবারিত হইল।

রাজা ব্যাধকে প্রচুর সোনা, একশত গাভী ও সুবর্ণপালঙ্ক দান করিলেন। ব্যাধ বলিল—"মহারাজ, এগুলি আমার দারাপুত্র গ্রহণ করুক, আমি প্রব্রজ্যা নিয়ে হিমবন্তে ফিরে চললাম। অবশিষ্ট জীবন তপ আচরণ করে সেখানে কাটাব।"

তখন হইতে রাজা তাঁহার রাজ্যে পশুপক্ষী ও মৃগয়াদি বধ চিরদিনের জন্য বন্ধ করিয়া দিলেন।

সোনার পরশ

প্রাচীনকালে মাইদাস নামে এক রাজা ছিল। স্বর্ণ-সংগ্রহ ও স্বর্ণসঞ্চয়, ইহাই ছিল তাহার জীবনের সাধনার বস্তু। এজন্য সে অকর্ম-কুকর্ম সবই করিত। কোথাও একটু সোনা পাইলে যেমন করিয়াই হউক সে আত্মসাৎ করিবেই। সোনা ছাড়া সে আর একটি জিনিস ভালবাসিত। সেটি তাহার সোনার মত মেয়ে মেরিগোল্ড।

মাইদাস সোনার স্বপ্ন ছাড়া অন্য কোন স্বপ্ন দেখিত না। সোনারঙের কিছু দেখিলেই ভাবিত, আহা, যদি উহা সত্যিই সোনা হইত! আকাশে সোনার রঙের মেঘ দেখিলেই ভাবিত, আহা, যদি উহাকে নিঙড়াইয়া সিন্ধুকে ভরা যাইত। পারা বা তামা হইতে কি করিয়া সোনা তৈরী করা যায়, সে চেষ্টারও অবধি ছিল না।

রাশি রাশি সোনার মালিক হইয়াও মাইদাসের মনে মোটেই স্বস্তি ছিল না। কারণ, পৃথিবীতে এমন সোনা এখনও যথেষ্টই রহিয়াছে, যাহা অন্যের অধিকারে। তাহা ছাড়া, মাটির তলাতে অনেক সোনা রহিয়া গিয়াছে, এখনও তাহা তাহার আয়ত্ত হয় নাই।

এই অস্বস্তি থাকিলেও মাইদাস যখন তাহার স্বর্ণভাণ্ডার খুলিয়া বসিত, তখন মোহরের ও জহরের বহর দেখিয়া তাহার আহ্লাদ কম হইত না! একদিন মাইদাস তাহার কোষাগারে বসিয়া মোহরের স্তূপ নাড়িয়াচাড়িয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে-

ছিল, এমন সময় দেখিল যে, জানালায় একখানা হাসি-হাসি মুখ। প্রথমটা দেখিয়া চমকিয়া গিয়াছিল। তারপর দস্যু-দানা নয় বুঝিয়া সাহস করিয়া মুখের দিকে চাহিল। মাইদাস বুঝিল, নিশ্চয়ই কোন স্বর্গদূত বা দেবতা তাহাকে বর দান করিতে আসিয়াছেন।

দেবতা বলিলেন—মাইদাস, দেখছি তুমি একজন ধনকুবের। এই দুনিয়ার কারো ঘরে এত ধনরত্ন নেই।

মাইদাস—না, না, ধনকুবের কিসের? সামান্য কিছু সঞ্চয় করেছি। কি কষ্ট ক'রে যে এই সামান্য সঞ্চয়টুকু করেছি তা যদি শোনেন তবে যথেষ্ট বলে একেবারেই মনে হবে না। সমস্ত জীবনের সঞ্চয় এই! হাজার বছর বাঁচলে এবং হাজার বছর ধরে সংগ্রহ করলে তবে সত্যকার ধনী হওয়া যায়।

দেবতা—কি বলছ? এতেও তুমি সুখী নও! সর্বনাশ! আচ্ছা, কি হলে তুমি সুখী হও, বলত?

মাইদাস—প্রভু, আমি এই সোনা কুড়াতে কুড়াতে হয়রান হ'য়ে গেছি, এভাবে আর সোনা জোগাড় করতে পারি না। দয়া ক'রে এই বর দিন, যেন আমি যা-কিছু ছোঁব, সবই সোনা হ'য়ে যায়।

দেবতা—এতেই তুমি ঠিক সুখী হবে? এর জন্য শেষে অনুতাপ করবে না তো?

মাইদাস—না প্রভু, এতে আর অনুতাপ করতে হবে কেন? আমি এই বর পেলেই ধন্য হয়ে যাই।

দেবতা 'তথাস্তু' এই বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া মাইদাসের আনন্দের অবধি

রহিল না। মাইদাস নৃত্য করিতে করিতে বাড়ীর সব আসবাবপত্র ছুঁইয়া বেড়াইতে লাগিল। ক্রমে মাইদাসের গৃহে সোনার জিনিস ছাড়া আর কিছুই থাকিল না। মাইদাস পোশাক পরিবর্তন করিল, পোশাকটিও সমস্ত সোনা হইয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে এত ভারী হইয়া গেল যে, চলাফেরা করাই শক্ত হইল। তাহাতে মাইদাসের বিন্দুমাত্র ক্ষোভ বা ক্লেশ নাই। সোনার ভার বহিতে বা স্বর্ণ-গর্দভ সাজিতে তাহার কোন আপত্তিই নাই।

মাইদাস খাইতে বসিল, খাইতে গিয়া বুঝিল কি বিভ্রাটই ঘটিয়াছে! যাহা কিছু মুখে দেয় সমস্তই সোনা হইয়া যায়। সোনা খাইয়া তো কেহ বাঁচে না। মাইদাসের খাওয়াই হইল না। জলপান করিতে গেল, তাহাও তরল স্বর্ণ হইয়া গেল। দিন শেষ হইয়া আসিল, একবিন্দু জলও মাইদাসের পেটে গেল না। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। কন্যা মেরিগোল্ড বাপের অবস্থা দেখিয়া ছুটিয়া আসিয়া কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে সোনার প্রতিমা হইয়া মাটিতে গড়াইয়া পড়িল। মাইদাস তখন হায় হায় করিতে লাগিল, দুই হাতে চুল ছিঁড়িয়া কাঁদিয়া বুকে করাঘাত করিয়া বাড়িময় ছুটাছুটি করিতে লাগিল। মাইদাস বুঝিল আজ তাহার চাহিতে কুঁড়েঘরের দীনতম ভিখারীও কত সুখী!

এই সময়ে দেবতা আবার আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—মাইদাস, সোনার পরশ পেয়ে কেমন সুখে আছ?

মাইদাস—দুঃখের অবধি নেই, ঠাকুর! বাঁচান, বাঁচান, আপনার বর আপনি এক্ষুণি ফিরিয়ে নিন।

দেবতা—এখন বল দেখি মাইদাস, সোনার পরশ চাও, না, এক বাটি জল চাও ?

মাইদাস—এক বাটি জল, ঠাকুর।

দেবতা—সোনার পরশ চাও, না, এক টুকরো রুটি চাও ?

মাইদাস—এক টুকরো রুটি, প্রভু।

দেবতা—সোনার পরশ চাও, না, সোনার মেয়ে মেরি-গোল্ডকে চাও ?

মাইদাস—হায় হায়, আমার বুকের মানিক! আর কি তাকে ফিরে পাব ? আমার যথাসর্বস্ব নিয়েও যদি কন্যাটিকে বাঁচিয়ে দাও, প্রভু, আমি তাই চাই। আর কিছু চাই না।

দেবতা—তবে এতদিনে তোমার চৈতন্য হয়েছে ? আচ্ছা, বাড়ীর পাশের নদীটাতে স্নান ক'রে এক কলসী জল নিয়ে সব জিনিসে ছিটিয়ে দাও, আবার সব স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসবে।

মাইদাস ছুটিয়া গিয়া নদীতে ঝাঁপাইয়া পড়িল এবং এক কলস জল লইয়া আসিয়া মেরিগোল্ডের সোনার প্রতিমার উপর ঢালিয়া দিল।

মেরিগোল্ড চোখ মেলিয়া বলিয়া উঠিল—"বাবা, বাবা, আমি যে একেবারে ভিজে গেলাম, গায়ে এত জল ঢালছ কেন ?

মাইদাস বড় করুণ ও নিদারুণ শিক্ষা পাইল। যতদিন বাঁচিয়াছিল আর কখনও সোনার নামও করে নাই।

আধসের বুকের মাংস

ইটালী দেশে ভিনিস নামক নগরে একজন সওদাগর বাস করিত। তাহার নাম এণ্টোনিও। বেসানিও নামে তাহার এক বন্ধু ছিল। দুইজনে হরিহরাত্মা। বেসানিওর অবস্থা একসময় ভালই ছিল। কিন্তু অতিরিক্ত খরচপত্র করিয়া সে বাপের বিষয়সম্পত্তি উড়াইয়া দিয়াছিল। এণ্টোনিও তাহাকে বহুবার অর্থ সাহায্য করিয়াছে এবং নানা প্রকারে তাহার মান ইজ্জৎ বরাবর বাঁচাইয়া আসিয়াছে।

পোর্শিয়া নামে একজন বিদুষী মহিলা পিতার মৃত্যুর পর অগাধ সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হইল। দুইটি কারণে বেসানিও তাহাকে বিবাহ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। প্রথমতঃ—বেসানিও মহিলাটিকে ভালবাসিয়াছিল; মহিলাটিও ভালবাসার প্রতিদান দিতে প্রস্তুত ছিল। দ্বিতীয়তঃ—তাহাকে বিবাহ করিতে পারিলে বেসানিওর অর্থকষ্ট দূর হইবে। কিন্তু পোর্শিয়াকে বিবাহ করিতে হইলে ধনী লোকের চালচলন বজায় রাখিয়া তাহার সহিত আলাপ-পরিচয় জমাইতে হইবে। সেজন্য আপাততঃ বেসানিওর কিছু টাকার বড় দরকার।

বেসানিও অভ্যাসমত এণ্টোনিওর কাছে কিছু টাকা চাহিল। এণ্টোনিওর হাত তখন একেবারে খালি। এণ্টোনিও তাহার সমস্ত টাকাকড়ি জড়ো করিয়া মাল কিনিবার জন্য কয়েকখানি জাহাজ বিদেশে পাঠাইয়াছে, এখন তাহারই হাতে কিছু নাই। এণ্টোনিও শেষে কিছু টাকা ধার করিয়া বেসানিওকে দিবার সঙ্কল্প

করিল। বেসানিওকে তো কেহ টাকা দিবে না, তাহার পশার নাই। কাজেই এণ্টোনিওকেই নিজের নামে ধার লইয়া টাকা সংগ্রহ করিতে হইল। দুইজনে ইহুদী মহাজন শাইলকের কাছে গেল।

এই শাইলকের একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক।

এই শাইলক ছিল একজন জোঁকের মত মহাজন। মানুষ বিপদে পড়িলে শাইলক খুব বেশি চড়া সুদে টাকা ধার দিত। একটি পয়সাও কখনও ছাড়িত না, লোকের সর্বস্ব বিক্রয় করিয়া লইত। এইরূপে মহাজনী কারবার করিয়া সে মহাধনী হইয়া উঠিয়াছিল। সে এণ্টোনিওকে মনে মনে ভয়ও করিত, ঘৃণাও করিত। ভয়ের কারণ, এণ্টোনিও ভিনিসের খৃষ্টান সমাজের গণ্যমান্য সওদাগর। সমস্ত শহরের লোক তাহাকে ভালবাসিত, শ্রদ্ধা করিত। ঘৃণার কারণ, এণ্টোনিও শাইলকের মহাজনী কারবারের ক্ষতি করিত। এণ্টোনিও বিপন্ন ব্যক্তিকে অল্প সুদে টাকা ধার দিত কিংবা শাইলকের কাছে যাহাতে না আসিতে হয়, তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিত।

এণ্টোনিও শাইলককে অন্তরের সহিত ঘৃণা করিত এবং প্রকাশ্যে টিট্‌কারী দিত। শাইলক কি করিয়া এণ্টোনিওকে জব্দ করিবে, তাহার উপায় ঠিক করিয়া উঠিতে পারিত না। এণ্টোনিওকে জব্দ করা সহজ নয়। তাহার কোন অভাব নাই, সে গণ্যমান্য ব্যক্তি, তাহার সহায় সম্বল প্রচুর, শহরশুদ্ধ লোক তাহাকে ভালবাসে।

এণ্টোনিও বেসানিওকে সঙ্গে লইয়া শাইলকের কাছে টাকা ধার করিবার জন্য গেল। প্রথম একদফা দুইজনের মধ্যে খুব

কথা কাটাকাটি ও রাগারাগি হইয়া গেল। কিন্তু শাইলক দেখিল, শিকার মিলিয়াছে, অযথা রাগ করিয়া তাহা হারানো ঠিক হইবে না। শেষে সে খুব নরম হইয়া বলিল,—"আচ্ছা, আমি টাকা দিচ্ছি। আমাকে তো সুদখোর ব'লে গাল দাও, দেখ, আমি একটি পয়সাও সুদ নেব না। তবে একটা দলিলে লেখাপড়া হোক, তাতে শুধু খেলাচ্ছলে একটা শর্ত থাকবে; —নির্দিষ্ট দিনে টাকা দিতে না পারলে আধসের বুকের মাংস কেটে দিতে হবে। ব্যাস্ আর কিছু না।"

বেসানিও বলিল—"না, ওকি কথা? যত খুশী সুদ নাও, বুকের মাংস আবার কি!"

সে এণ্টোনিওকে বলিল,—"না, ও দলিলে সই ক'রো না।"

এণ্টোনিও বলিল—"বন্ধু, তুমি মিছে ভয় করছ। লক্ষ লক্ষ টাকার জাহাজ বোঝাই মাল আমার শীঘ্রই এসে পড়বে। কিছু ভেবো না। ভারি তো কয়েক হাজার টাকা!"

এণ্টোনিও দলিলে নাম সহি করিয়া হাসিতে হাসিতে টাকা লইয়া আসিল। বেসানিওর মনটা কিন্তু একটা অজানা আশঙ্কায় বিষণ্ণ হইয়া পড়িল।

এই টাকা লইয়া বেসানিও ধনী লোকের চালে চলিতে লাগিল এবং পোর্শিয়ার সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিয়া লইল। এইভাবে কয় মাস কাটিয়া গেল। বেসানিও ভিনিস হইতে কিছু দূরে পোর্শিয়ার বাড়ীতেই বাস করিতে লাগিল, যদিও তখনও তাহাদের বিবাহ হয় নাই।

হঠাৎ এই সময়ে একদিন এণ্টোনিওর এক চিঠি আসিল,—আমার সব জাহাজ সাগরে ডুবিয়া গিয়াছে। শাইলকের

কাছে দেনা ছিল, তাহার শোধ দেওয়ার মেয়াদ অতীত হইয়াছে। আমি এখন হাজতে আছি। শীঘ্রই আমার জীবনান্ত হইবে। যদি পার তো শেষ দেখা দিয়া যাও।

চিঠি পড়িয়া বেসানিওর হাত কাঁপিতে লাগিল। সে সহসা কাঁদিয়া উঠিল। পোর্শিয়া তাড়াতাড়ি ব্যস্ত হইয়া কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ব্যাপার কি ? খুলে বল।"

বেসানিও সমস্ত কথা খুলিয়া বলিল,—"আমি অতি লক্ষ্মী-ছাড়া। আমার কিছুই নেই। আমি আমার বন্ধুর ধার-করা টাকায় নবাবী করছিলাম। আমি অতি পাষণ্ড, আমার জন্যই বন্ধুর প্রাণদণ্ড হ'তে চলল।"

পোর্শিয়া বেসানিওকে আশ্বাস দিয়া বলিল—"আমাদের বিয়েটা তাড়াতাড়ি হয়ে যাক। বিয়ে হ'লে আমার সম্পত্তিতে তোমার অধিকার জন্মাবে। তারপর চলে যাও, যত টাকা লাগে দিয়ে তোমার বন্ধুকে বাঁচাও। ভয় নেই।"

বেসানিও বিশ হাজার টাকা লইয়া গেল।

পোর্শিয়া কিন্তু টাকার উপর ভরসা করিয়া থাকিতে পারিল না। তাহার এক আত্মীয় ব্যারিস্টার ছিলেন, তাঁহার কাছ হইতে ব্যারিস্টারের পোশাক ও আদালতে ব্যারিষ্টার হইয়া মোকদ্দমা চালাইবার জন্য অধিকারপত্র আনাইল। এসব কথা বেসানিও জানিতেও পারিল না।

নির্দিষ্ট দিনে এণ্টোনিওর মোকদ্দমা আদালতে উঠিল। বেসানিও টাকার তোড়া লইয়া শাইলককে সাধাসাধি করিতে লাগিল,—"যত টাকা খুশী নাও, দ্বিগুণ, চতুর্গুণ, দশগুণ, বিশ-গুণ। দয়া করে দলিলটা ছিঁড়ে ফেল।"

শাইলক কিছুতেই সম্মত হইল না। পোর্শিয়া ব্যারিষ্টারের বেশে এণ্টোনিওর মোকদ্দমা চালাইতে আদালতে আসিল। তাহাকে দেখিয়া বেসানিও-ও চিনিতে পারিল না, ভাবিল,—পোর্শিয়া টাকা দিয়া কোন ব্যারিষ্টারকেই পাঠাইয়া দিয়াছে!

পোর্শিয়া বলিল—"শাইলকের দলিলে যা লেখা আছে তাতে এণ্টোনিওকে আধসের মাংসই দিতে হয়। দেশের আইন অনুসারে এর অন্যথা হবার উপায় নেই। এখন শাইলকের দয়ার উপর নির্ভর। মিছামিছি একটা মানুষের প্রাণ নিয়ে কি হবে? শাইলক কি এতই নিষ্ঠুর হবে?"

পোর্শিয়া শাইলককে দশগুণ টাকা লইয়া মিটাইয়া ফেলিবার জন্য অনুরোধ করিল। শাইলক তাহাতে রাজী হইল না। তখন পোর্শিয়া দয়াধর্মের গুণগান করিয়া বক্তৃতা দিল এবং শাইলককে দয়া করিবার জন্য যথেষ্ট অনুরোধও করিল। কিছুতেই শাইলকের কঠোর হৃদয় বিগলিত হইল না।

পোর্শিয়া তখন নিরুপায় হইয়া বলিল,—"তবে তোমার ছোরা বার কর। এণ্টোনিও, আপনিও প্রস্তুত হোন।"

এণ্টোনিও বন্ধুর নিকট চিরবিদায় লইল। বেসানিও কাঁদিতে লাগিল। শাইলক আহ্লাদে আত্মহারা হইয়া ছোরা শানাইতে লাগিল।

পোর্শিয়া বলিল—"শাইলক, তুমি তো প্রস্তুত? এবার একজন ডাক্তার ডাক। তৌলদাঁড়ী ঠিক কর, আধসেরের চেয়ে একটি বিন্দুও যেন বেশি না হয়। আর এই মাংস কাটতে যদি একবিন্দুও রক্ত পড়ে, তবে কিন্তু তোমার শাস্তি হ'বে। তোমার দলিলে শুধু আধসের মাংসের কথা আছে, রক্তের কথা

নেই, একবিন্দু রক্তেও তোমার অধিকার নেই, মনে থাকে যেন। আর মাংস নেবারই কিন্তু অধিকার তোমার আছে, প্রাণ নেবার অধিকার নেই। মাংস কাটতে গিয়ে রক্তপাত না হয়, প্রাণ না যায়, সে জন্য একজন ডাক্তার চাই।"

শাইলক বলিল—"না না, দলিলে এসব কথা লেখা নেই।"

পোর্শিয়া বলিল—"হ্যাঁ, দলিলে রক্তের কথাও নেই। একবিন্দু খ্রীষ্টান রক্তপাত করলে কিন্তু আইনত তোমার প্রাণদণ্ড হবে, বলে রাখছি।"

শাইলক ভয় পাইয়া গেল। রক্তপাত না করিয়া মাংস কাটা অসম্ভব ভাবিয়া তখন বলিল—"তবে দাও, আমার টাকা দাও, মাংসে কাজ নেই।"

পোর্শিয়া বলিল—"টাকা নেওয়ার কথাও নেই, মাংস নেওয়ারই কথা। মাংস নিতে পার, নাও। তুমি একজন নিরপরাধ নগরবাসীর প্রাণ নেওয়ার সঙ্কল্প করেছিলে সেই অপরাধে তোমার সম্পত্তি সব বাজেয়াপ্ত আর তোমার জীবন ডিউকের হাতে। তিনি ক্ষমা করেন তো প্রাণরক্ষা হবে। নইলে তোমার ধন-প্রাণ দুইই গেল।"

ডিউক শাইলকের প্রাণভিক্ষা দিলেন। কিন্তু সমস্ত সম্পত্তি সরকারে বাজেয়াপ্ত করিয়া লইলেন। শাইলক তখন লাঠিতে ভর দিয়া আস্তে আস্তে আদালত হইতে চলিয়া গেল।

বেসানিও পরে জানিতে পারিল যে, তাহার বুদ্ধিমতী বিদুষী পত্নীই তাহার বন্ধুর জীবন রক্ষা করিয়াছে।

দৈবের নিবন্ধ

লিডিয়ার রাজা ক্রিশাসের ধনভাণ্ডার ছিল পরিপূর্ণ। সেকালে তাঁহার মত ধনী ব্যক্তি ইউরোপের দক্ষিণাংশে কেহ ছিল না। যেমন তাঁহার ধনবল ছিল, তেমনি তাঁহার ছিল জনবল। তিনি লক্ষাধিক সৈনিক প্রতিপালন করিতেন।

তাঁহার দুই পুত্র ছিল। তাহাদের মধ্যে একটি ছিল বোবা। অন্য পুত্রটিই তাঁহার সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হইবে ইহাই ছিল তাঁহার ভরসা।

ক্রিশাস একদিন স্বপ্ন দেখিলেন যে, তাঁহার প্রিয় পুত্র শাণিত অস্ত্রের আঘাতে হত হইয়াছে। একই স্বপ্ন পরপর তিনি তিনবার দেখিলেন।

এই স্বপ্ন দেখিয়া তাঁহার চিত্ত বিচলিত হইল। তিনি সন্তানের কল্যাণার্থে ঘটা করিয়া দেবদেবীর পূজা দিতে লাগিলেন, বহু পশু বলি দিলেন। পুত্রের জীবন সম্বন্ধে তিনি এতই সতর্ক হইলেন যে, তিনি পুত্রকে আর অস্ত্র পর্যন্ত স্পর্শ করিতে দিতেন না, বাসভবনের যেখানে যত অস্ত্রশস্ত্র লম্বমান ছিল, সমস্ত সরাইয়া ফেলিলেন, এমন কি রাজধানীর মধ্যে কৃত্রিম সমর বা অস্ত্রচালনাও বন্ধ করিয়া দিলেন। পাছে জনসাধারণের গুণগান শুনিয়া যুবরাজের মনে যশের আকাঙ্ক্ষা উদ্দীপিত হয়, সেজন্য যুবরাজের গুণকীর্তনও তিনি বন্ধ করিয়া দিলেন।

ক্রিশাস দেশবিদেশ খুঁজিয়া সর্বশ্রেষ্ঠ সুন্দরী তরুণীর সহিত পুত্রের বিবাহ দিলেন। পুত্র সুন্দরী পত্নী লাভ করিয়া যুদ্ধ-বিগ্রহের কথা ভুলিয়া থাকিবে ইহাই তিনি মনে করিলেন।

বিবাহের পরদিন ফ্রিজিয়ার রাজকুমার আসিয়া তাঁহার শরণাগত হইল। এই রাজকুমার খেলা করিতে করিতে অনিচ্ছায় তাহার ভ্রাতাকে বধ করিয়া ফেলিয়াছিল।

ভ্রাতৃবধের পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য সে দেশ ত্যাগ করিয়া পথে পথে ভ্রমণ করিতেছিল। ক্রিশাস তাহাকে আশ্রয় দিলেন এবং তাহার পাপস্খালনের জন্য দেবদেবীর পূজা দিলেন। ফ্রিজিয়ার রাজকুমারের সহিত যুবরাজের নিবিড় বন্ধুতা জন্মিল।

যুবরাজ এই পলাতক রাজকুমারের সঙ্গেই সারাদিন কাটাইতেন। তাহার মুখে অনবরত বীরত্বের কাহিনী শুনিয়া শুনিয়া যুবরাজের মনেও বীরত্বের পিপাসা জাগিয়া উঠিল।

এই সময় একটি গ্রামের কতকগুলি প্রজা আসিয়া রাজার নিকট আবেদন জানাইল—"একটি বন্য শূকরের উৎপাতে আমরা বড়ই বিপন্ন। এই বন্য শূকরটি বহু নরনারীর জীবন নাশ করেছে। তার ভয়ে আমরা বাড়ির বা'র হতেই পারি না। আপনি যুবরাজকে পাঠিয়ে দিন, বন্য শূকরটিকে বধ করুক।"

রাজা বলিলেন—"তোমরা নিশ্চিন্ত হয়ে বাড়ি যাও। আমি আমার সেনাপতিকেই পাঠাচ্ছি এর প্রতিবিধানের জন্য। যুবরাজকে পাঠাতে পারব না।"

প্রজাবৃন্দ চলিয়া গেল, যুবরাজ শুনিলেন প্রজাগণ তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিতে আসিয়াছিল। তিনি তাঁহার পিতার নিকট আসিয়া বলিলেন—"বাবা, আমি কি চিরদিন কাপুরুষ হয়ে অন্তঃপুরে বাস করব? আমাকে কি পরে রাজত্ব করতে হবে না? আমি যে জীবন যাপন করছি তা অসহ্য। আমিই বন্য শূকরটি বধ করতে যাব।"

রাজা—বৎস, আমি যে স্বপ্ন দেখেছি তা তুমি শুনেছ। তবে একথা কেন বলছ? তুমি জীবিত না থাকলে এ রাজ্য ধন নিয়ে কি হবে?

যুবরাজ—স্বপ্ন আমি বিশ্বাস করি না, তবে আপনি যখন বিশ্বাস করেন তখন আমি তার অমর্যাদা করতে পারি না। শাণিত অস্ত্রের আঘাতে আমার মৃত্যু হবে এরূপ স্বপ্ন আপনি দেখেছেন, বন্য শূকরের দন্তে আমার প্রাণ বিয়োগ হবে এরূপ স্বপ্ন-তো দেখেন নি!

যুবরাজের পীড়াপীড়িতে রাজা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া দেব-দেবীগণকে স্মরণ করিয়া সম্মতি দিতে বাধ্য হইলেন।

রাজা ফ্রিজিয়ার যুবরাজকে ডাকিয়া বলিলেন—"যুবরাজ শিকারে যাচ্ছে, তুমি তার পরম বন্ধু। তুমি তার সঙ্গী হলে কতকটা নিশ্চিন্ত হতে পারি।"

ফ্রিজিয়ার যুবরাজ বলিলেন—"মহারাজ, আপনার কোন চিন্তা নেই। আমার প্রাণ থাকতে যুবরাজের কোন অনিষ্ট হবে না। আমি সর্বদা কুমারের পাশে থাকব, যদি কোন বিপদ আসন্ন হয়, আমি নিজে বুক দিয়ে কুমারকে বাঁচাব। আমার জীবনে বিন্দুমাত্র মমতা নেই। মহারাজ! ভ্রাতৃহন্তার মৃত্যুই প্রায়শ্চিত্ত।"

রাজা দুই যুবরাজকে আশীর্বাদ করিয়া বিদায় দিলেন। অনেক বলিষ্ঠ অনুচর ইহাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

যে বনে বন্য শূকরটি ছিল রাজার লোকজন তাহা ঘিরিয়া ফেলিল। দুই যুবরাজ বর্শা হাতে করিয়া সকলের আগে আগে চলিলেন। বন্য শূকর কোন দিকে পলাইবার পথ না পাইয়া যুবরাজের দিকে ছুটিয়া আসিল। দুই যুবরাজই একই সময়ে

বর্শা ছুড়িল। বন্য শূকর চীৎকার করিয়া পড়িয়া গেল। লিডিয়ার যুবরাজ শূকরের মুণ্ডচ্ছেদনের জন্য খড়্গ হস্তে অগ্রসর হইলেন। বন্ধু ভাবিলেন শূকর এখনও মরে নাই, আহত হইয়া পড়িয়া আছে। কুমার নিকটবর্তী হইলেই হয়তো কুমারকে আক্রমণ করিয়া মারিয়া ফেলিবে। কুমারের জীবন-হানির আশঙ্কায় বন্ধু যুবরাজ আর একখানি বর্শা শূকরকে লক্ষ্য করিয়া ছুড়িলেন। সেই বর্শা ঘুরিয়া লিড়িয়ার যুবরাজের বক্ষ ভেদ করিল। যুবরাজ সঙ্গে সঙ্গে প্রাণ হারাইল।

ফ্রিজিয়ার যুবরাজ যখন দেখিল, বন্ধু তাহার বর্শাতেই হত, তখন নিজেও আত্মহত্যা করিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু অনুচর-গণ আসিয়া তাহাকে বন্দী করিয়া লইয়া গেল।

এদিকে ক্রিশাস যুবরাজকে শিকারে পাঠাইয়া অস্থির হইয়া ঘরবাহির করিতেছেন। এমন সময় যুবরাজের মৃতদেহ আসিল। রাজা ক্রিশাসের যে কি দশা হইল তাহা বর্ণনা করা যায় না! আদ্যোপান্ত সকল কথা শুনিয়া ক্রিশাস বলিলেন—'দেবতারাই ফ্রিজিয়ার যুবরাজের বর্শাকে বিপথে চালিত করেছেন—হত্যাকারী যুবরাজকে ছেড়ে দাও।'

মহাসমারোহে কুমারের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার আয়োজন হইল। কুমারের শব যখন চিতায় চড়ানো হইল, তখন ফ্রিজিয়ার যুবরাজ ছুটিয়া আসিয়া সেই চিতায় ঝাঁপ দিল। দুই যুবরাজের দেহ এক সঙ্গে ভস্মীভূত হইল।

এত ধনবল, এত জনবল, এমন দোর্দণ্ড প্রতাপ, এমন সুখের রাজসংসার, এমন আনন্দনিকেতন রাজ্য সমস্তই ব্যর্থ করিয়া ক্রিশাসের সকল সতর্কতা ব্যর্থ করিয়া স্বপ্নকে সত্য করিয়া যুবরাজ চলিয়া গেল।

I.C.E.R.T. W.B. LIBRARY
Date 3.7.06
Acc. No. 12198

Library
Calcutta

জাপানী গল্প

সে অনেকদিনের কথা। জাপান তখন এত প্রতাপান্বিত হয় নাই। তখন জাপানীরা ছিল যেমন সরল, তাহাদের জীবনযাত্রাও ছিল তেমনি অনাড়ম্বর। তখন কিয়োটো ছিল রাজধানী। রাজধানী হইতে ২৫ ক্রোশ দূরে একটি গ্রামে সেণ্ডারো নামে একজন সূত্রধর বাস করিত। সংসারে তাহার স্ত্রী ওহানা ও কন্যা ইরহি ছাড়া কেহ ছিল না। তিনটিতে একটি সুখের সংসার রচনা করিয়া দিন কাটাইত। কোন বিশেষ কারণে একবার সেণ্ডারোকে রাজধানীতে যাইতে হইল। ওহানা কখনও একলা থাকে নাই, সে তো ভয়েই অস্থির। সেণ্ডারো ওহানাকে অনেক বুঝাইয়া সাত দিনের মধ্যে আসিব বলিয়া চলিয়া গেল। সেণ্ডারোর সাত দিনের জায়গায় একুশ দিন হইয়া গেল, তবু সেণ্ডারো ফিরিল না। ওহানা ও ইরহি দুজনে সারাদিন আশাপথ চাহিয়া থাকে, রাত্রিকালেও ভাল করিয়া ঘুমায় না, কান্নাকাটি করে। সেকালে চিঠিপত্র পাঠানোরও সুযোগ ছিল না।

পঁচিশ দিনের দিন সেণ্ডারো ফিরিয়া আসিল। রাজধানীতে গিয়া সেণ্ডারো একটি এমন কাজ পাইয়াছিল যাহাতে সে যথেষ্ট উপার্জন করিল। সেই অর্থে সে স্ত্রীকন্যার জন্য অনেক সুন্দর সুন্দর শখের জিনিস কিনিয়া আনিল। সেগুলি পাইয়া ওহানা ও ইরহি বড়ই খুসী হইল। উপহারের জিনিসগুলির মধ্যে ছিল একটি আয়না। ওহানা কখনও আয়না দেখে নাই, আয়না বলিয়া কোন জিনিস আছে বলিয়াও

সে জানিত না। ওহানা আয়নাটির পানে চাহিয়া অবাক হইয়া গেল। সেণ্ডারো ওহানাকে জিজ্ঞাসা করিল—ওটার মধ্যে কি দেখে এত হাসছ ?

ওহানা—দেখছি, একটি সুন্দরী রমণী আমার মত পোশাক পরে হাসছে এবং আমার সঙ্গে কথা বলতে চেষ্টা করছে। এ ভারি অদ্ভুত !

সেণ্ডারো—ও মেয়েটিকে তুমি কখনও কোথায় দেখেছ ?

ওহানা—কোথায় যেন দেখেছি বলে মনে হচ্ছে। বড় সুন্দরী কিন্তু মেয়েটি, বার বার ওকে দেখতে ইচ্ছে করছে।

সেণ্ডারো—আচ্ছা পাগল ! ও মেয়েটি যে ওহানা ছাড়া অন্য কেউ নয়, বুঝতে পারছ না ? তোমারই মুখের ছবি ওতে পড়েছে, তুমি হাসছ তাই ও হাসছে। তুমি কথা কইছ, তাই ও-ও কথা বলার ভঙ্গী করছে। ও জিনিসটার নাম আয়না। যে ওটার পানে চাবে তারই মুখ ওতে ফুটে উঠবে।

ওহানা নিজের রূপ নিজের চোখে দেখিয়া বড় আনন্দ পাইল এবং তাহার আয়নাখানিকে অতি যত্নে লুকাইয়া রাখিল। ইরহির যখন পনেরো বৎসর বয়স তখন তাহার চেহারাও অনেকটা মায়ের মতই হইল। ওহানা রোগে পড়িল, ইরহি প্রাণপণে সেবা করিতে লাগিল। কিন্তু ওহানার অবস্থা দিন দিন খারাপই হইতে লাগিল। ওহানার প্রথম চিন্তা, তাহার মৃত্যু হইলে মেয়েটি কি করিয়া শোক সংবরণ করিবে ! সরলা বালিকা, দুঃখ শোক কাহাকে বলে কখনও জানে না, মাতৃশোক সে ভুলিবে কি করিয়া ? স্বামীর জন্যও তাহার উদ্বেগ অল্প ছিল না—তবু সে পুরুষ মানুষ, কাজকর্মে কতকটা ভুলিয়া থাকিতে পারে, কিন্তু

ইরহি ভুলিবে কি করিয়া ? ওহানার জীবনদীপ ক্রমে নিভিয়া আসিতে লাগিল।

ওহানা ইরহিকে শয্যাপার্শ্বে ডাকিয়া বলিল,—"মা আমার দিন ফুরিয়ে এসেছে। আমি দু'চারদিনের মধ্যেই মরব। তোমাকে আমি একটা জিনিস দিয়ে যাচ্ছি—তা এই বাক্সের মধ্যে আছে। আমি মরে গেলে এই বাক্সটি খুলবে। এতে যে চকচকে একটা জিনিস আছে তার পানে চাইলেই তুমি আমাকে দেখতে পাবে। আমি কথা কইতে পারব না, কিন্তু তোমার পানে চেয়ে থাকব। যখনই তোমার আমাকে দেখতে ইচ্ছে হবে, তুমি সেই জিনিসটার দিকে চেয়ে থেক।"

ইরহি কাঁদিতে কাঁদিতে কাঠের বাক্সটি লইয়া তাহার পেটরার মধ্যে রাখিয়া দিল। ওহানা চার-পাঁচ দিন পরেই চিরবিদায় গ্রহণ করিল। সেণ্ডারো সাত-আট দিন ধরিয়া কান্নাকাটি করিল, তারপর কন্যাটির মুখ চাহিয়া আবার কাজ কর্ম করিতে লাগিল। ইরহির চোখের জল আর ফুরায় না! তাহার আহার নিদ্রা ঘুচিয়া গেল। সেণ্ডারো ইরহিকে সান্ত্বনা দিতে লাগিল। ইরহির কাছে সকল সান্ত্বনাই ব্যর্থ।

একদিন ইরহির মনে পড়িল, মায়ের দেওয়া কাঠের বাক্সটির কথা। ইরহি বাক্সটি খুলিয়া পাইল সেই আয়নাটি। আয়নাটির পানে চাহিয়া ইরহি দেখিল যে তাহার মধ্যে সত্যই তাহার মা, ম্লানমুখে তাহার পানে চাহিয়া আছে। মায়ের চেহারাটা কিন্তু তাহার অনেক দিনকার আগেকার। ইরহির বয়স যখন পাঁচ-ছয় বৎসর ছিল তখন তাহার মায়ের চেহারা যেমন ছিল, আয়নার মধ্যে তেমনটি সে দেখিতে পায়, একেবারে জীবন্ত! ইরহি

দিনরাত আয়নাটির পানে চাহিয়া তাহার মাকে দেখে, মায়ের সঙ্গে কথা বলে, উত্তর পায় না বটে, কিন্তু মা যে সব কথা শুনিতেছে ও বুঝিতেছে তাহা তাহার মনে হয়। আয়নাটিকে সে বুকে করিয়া রাখে, মাথার শিয়রে রাখিয়া ঘুমায়। সেণ্ডারো দেখিল যে, কন্যা সারাদিন আয়নাটির পানে চাহিয়া থাকে, তাহার শোক আর নাই। সে ক্রমে প্রকৃতিস্থ হইয়া আসিতেছে।

সেণ্ডারো ইরহিকে জিজ্ঞাসা করিল—"মা, তুমি সারাদিন আয়নাটার পানে চেয়ে থাক কেন?"

ইরহি বলিল—"বাবা, তোমাকে এত দিন বলিনি। এই জিনিসটার মধ্যে আমি মাকে দেখতে পাই। মা আমার পানে জীবন্ত চোখে চেয়ে থাকেন। মা আমায় মৃত্যুকালে এটা দিয়ে বলেছিলেন যে, 'ইরহি, যখন আমাকে দেখতে ইচ্ছে হবে এটার মধ্যে তুমি আমাকে দেখতে পাবে।' বাবা, মা আমাদের ছেড়ে একেবারে চলে যান নি, তিনি এ জিনিসটার মধ্যে লুকিয়ে আছেন। বাবা, তুমি মাকে দেখবে? এটার পানে চাও, তা হলেই দেখতে পাবে।"

সেণ্ডারো সব কথা বুঝিল। কেন যে ওহানা ওটা ইরহিকে দিয়া ওকথা বলিয়া গিয়াছিল সেণ্ডারো বুঝিল। হায়! সরলা বালিকা, নিজের চেহারাকেই মায়ের তরুণ বয়সের চেহারা মনে করিয়া তাহাতেই সে সান্ত্বনা লাভ করিতেছে! এ জীবনের সকল সান্ত্বনাই মিথ্যা, এটাও মিথ্যা—এটাও স্বপ্ন, এ মধুর স্বপ্ন না ভাঙ্গাই উচিত।

সেণ্ডারো আয়নাটির পানে চাহিয়া রহিল, তাহার চোখ দিয়া অবিরল ধারায় অশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল।

অদ্ভুত লক্ষ্যভেদ

এক সময়ে সুইজারল্যাণ্ড অষ্ট্রিয়ার অধীনে ছিল। জেস্‌লার নামে একজন অষ্ট্রিয়াদেশীয় শাসনকর্তা সুইসদের উপর বড়ই অত্যাচার করিত। সে বাজারের চৌরাস্তার ধারে একটি খুঁটির উপর নিজের টুপি রাখিয়া ঘোষণা করিল যে, সকলকেই এই খুঁটির সম্মুখে মাথা নোওয়াইয়া অভিবাদন করিতে হইবে। কোন সুইসই জুলুমবাজ জেস্‌লারের টুপিকে শ্রদ্ধাভরে প্রণাম করিতে রাজী ছিল না, কিন্তু সাহস করিয়া শাসনকর্তার আদেশ অমান্য করিতে পারিত না। লোকে বাজারের পথ দিয়া যাতায়াত করাই ছাড়িয়া দিল।

উইলিয়ম টেল ছিল পল্লীগ্রামের লোক। কোন কারণে সে নগরে আসিয়াছিল, তাহার সঙ্গে ছিল আট বৎসর বয়সের পুত্র। বাজারের পথ দিয়া যাইবার সময়ে সে জেস্‌লারের টুপিকে অভিনন্দন না করিয়াই চলিয়া যাইতেছিল। প্রহরী তাহাকে ধরিয়া বলিল—

"এইখানে মাথা নোওয়াও, রাজার হুকুম জান না।"

টেল—না আমি মাথা নোওয়াব না। আমি যেখানে-সেখানে মাথা নোওয়াই না।

প্রহরী—যদি মাথা না নোওয়াও তবে তোমায় বন্দী ক'রে নিয়ে যাব।

টেল—বন্দী কর, মাথা কিছুতেই নোওয়াব না।

প্রহরী টেলকে বন্দী করিয়া জেস্‌লারের কাছে লইয়া গেল।

জেস্‌লার জিজ্ঞাসা করিল—তোমার নাম কি ?

টেল—কেন জিজ্ঞাসা করছেন ? আমার নাম উইলিয়ম টেল।

জেস্‌লার—তুমি কি সেই টেল, লক্ষ্যভেদে যার সমকক্ষ কেউ নেই বলে শোনা যায় ?

টেল—লক্ষ্যভেদে আমি অনেক ক্ষেত্রে জয়লাভ করেছি সত্য। কিন্তু আমার সমকক্ষ কেউ নেই, এ কথা বলতে পারি না।

জেস্‌লার—তোমার সঙ্গে ওটি কে ?

টেল—আমার পুত্র।

জেস্‌লার—জান, তুমি কি অপরাধ করেছ ? এর দণ্ড কি তা জান ?

টেল—অপরাধ কিছু করেছি বলে তো মনে হয় না। কিন্তু সাজা দিতে হয়, দিন।

জেস্‌লার—আচ্ছা, তুমি একজন প্রসিদ্ধ ধনুর্ধর। তোমাকে আমি মুক্তি দিতে পারি, যদি তুমি তোমার ঐ ছেলের মাথায় একটি আপেল রেখে ১০০ গজ দূর থেকে সেটাকে বিঁধতে পার।

টেল—তুমি কি মানুষ, না রাক্ষস ? তুমি বাপকে দিয়ে পুত্র হত্যা করতে চাও। না, আমি ওরূপ শর্তে মুক্তি চাই না।

জেস্‌লার—বটে ! তোমার এত তেজ ! তুমি ভেবেছ এই লক্ষ্যভেদ না করলেই তুমি তোমার ছেলেকে বাঁচাতে পারবে। না, তা হবে না। তোমার ঔদ্ধত্যের দণ্ডস্বরূপ তোমার পুত্রটিকে হত্যা করা হবে।

টেল মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। টেলের পুত্র

এলবার্ট পিতার গায়ে হাত দিয়া বলিল—"বাবা, তুমি কেন ভয় পাচ্ছ ? তুমি তো এমন লক্ষ্য অনেকবারই ভেদ করেছ, তবে ভয় পাচ্ছ কেন ?"

টেল—বৎস, তোমার মাথার উপর আপেল রেখে কখনো লক্ষ্য ভেদ করিনি। যদি হাত কেঁপে যায় তা' হ'লে কি হবে ?

পুত্র—আমার কিছু মাত্র ভয় নেই, বাবা। তুমি ভয় পেয়ো না। একটা গাছের ডালে আপেল আছে মনে ক'রে তুমি তীর ছোঁড়। কখনো তোমার হাত কাঁপেনি, আজও কাঁপবে না। আর যদি কাঁপেই, তবে আমি মরব, মরতে আমি ডরাই না।

টেল খানিকক্ষণ ভাবিয়া লইয়া বলিয়া উঠিল—"আচ্ছা, আমি চেষ্টা করব। আপেল নিয়ে এস।"

জেসলার আপেল আনাইয়া টেলের পুত্রের মাথায় আপেল রাখিয়া লক্ষ্যভেদ করিবার জন্য টেলকে আদেশ দিল। চারিদিকে হাজার হাজার লোক দাঁড়াইয়া গেল, সৈনিকগণ ছাড়া সকলেই সুইস। সুইসরা একমনে ভগবানকে ডাকিতে লাগিল। টেল তাহার পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া বলিল—"বৎস, ভয় পেয়ো না, নড়ো না—। ভগবানকে ডাক।"

পুত্র বলিল—"বাবা, আমি স্থির হ'য়ে থাকব, তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে তীর ছোঁড়।"

টেল চীৎকার করিয়া বলিল—"সকলে একটুও শব্দ না ক'রে দাঁড়িয়ে থাকুন।"

সকলে রুদ্ধ নিশ্বাসে তাকাইয়া রহিল। টেল তীর নিক্ষেপ করিল, আপেল দুই ভাগে খণ্ডিত হইল। টেল

তীর ছুঁড়িয়াই চোখে আঁধার দেখিতে লাগিল, তাহার মাথা ঘুরিতে লাগিল, সে অবসন্ন হইয়া বসিয়া পড়িল। চারিদিকের জয়ধ্বনিতে টেল বুঝিল যে, পুত্রের কোন ক্ষতি হয় নাই। বীর পুত্র ছুটিয়া আসিয়া পিতার বুকে পড়িয়া বলিল—"বাবা আমি অক্ষত।"

টেলের চোখ দিয়া এতক্ষণে জল ঝরিতে লাগিল। জেস্‌লার টেলকে ডাকিয়া পাঠাইয়া বলিল—"বীর তুমি মুক্তি পেলে, তোমার অপরাধ ক্ষমা করিলাম। তুমি কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছ, তোমার ছেলে বেঁচে গেল।"

টেল বলিল—"কেবল আমার ছেলে নয়, তুমিও প্রাণে বেঁচে গেলে। ভগবানকে ধন্যবাদ দাও। যদি আমার তীর ছেলের গায়ে লাগত, তা হলে আর একটি তীর দেখছ আমার কোমরবন্ধে গোঁজা, এইটি দিয়ে তোমাকেও বধ করতাম।"

জেস্‌লার চীৎকার করিয়া বলিল—"ধর ঐ দুর্বৃত্তটাকে বন্দী কর।"

টেল বন্দী হইল, কিন্তু অস্ট্রীয়ার রাজশক্তি তাহাকে বন্দী করিয়া রাখিতে পারিল না। প্রহরারা টেলকে হ্রদ পার করিয়া লইয়া যাইতেছিল, পথে ভীষণ ঝড় উঠিয়া নৌকা পথ হারাইয়া ফেলিলে তাহারা টেলের হাতকড়া খুলিয়া দিতে বাধ্য হইল। প্রহরীদের ক্ষমতা ছিল না নৌকা বাঁচায়। টেল ছাড়া সে বিপদে কে হাল ধরিবে? টেল নিজে নৌকা বাহিয়া নৌকা হইতে লাফাইয়া পাহাড়িয়া জঙ্গলের মধ্যে অন্তর্হিত হইল। জেস্‌লার বহু চেষ্টাতেও তাহাকে আর ধরিতে পারে নাই।

নিয়তির খেলা

কৌশম্বীর প্রধান শ্রেষ্ঠী রত্নদত্ত বাণিজ্যের জন্য বারাণসী নগরে বাস করিতেছিল। কাশীরাজ্যের জ্যোতিষী গণনা করিয়া বলিলেন—"আজ কৌশম্বীর ভবিষ্যৎ সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠীর জন্ম হল।"

রত্নদত্তের পত্নী গর্ভবতী ছিল, রত্নদত্ত ভাবিল, নিশ্চয় তাহার পুত্রসন্তান জন্মিয়াছে। তখনই অশ্বারোহী দূত প্রেরিত হইল। কয়দিন পরে দূত ফিরিয়া আসিয়া বলিল যে, রত্নদত্তের সন্তান হয় নাই। রত্নদত্ত এ সংবাদে উৎকণ্ঠিত হইয়া কৌশম্বীতে ফিরিয়া আসিল। ফিরিয়া আসিয়াই এক বুদ্ধিমতী দাসীকে বলিল—"তুমি নগরে ঘুরে সন্ধান নাও, কার ঘরে ঐদিন পুত্র জন্মেছে। যত টাকা লাগে দেব। ঐ ছেলেটিকে সংগ্রহ ক'রে আনতে হবে!"

দাসী খোঁজ করিয়া জানিল, যে দিনের কথা জ্যোতিষী বলিয়াছিল তাহার পরদিন ভোরবেলায় নগরের ঝাড়ুদার পথের পাশে একটি সদ্যোজাত শিশু কুড়াইয়া পাইয়া পালন করিতেছে। রত্নদত্ত ঝাড়ুদারকে সহস্র মুদ্রা দিয়া শিশুটিকে সংগ্রহ করিল। শিশুটি পরম সুন্দর—রাজপুত্রের মত সুদর্শন! রত্নদত্ত ঠিক করিল, যদি তাঁহার গৃহিণীর কন্যা-সন্তান জন্মে, তবে তাহার সহিত এই ছেলেটির বিবাহ দিবে। আর যদি পুত্র-সন্তান জন্মে, তাহা হইলে তাহাকে হত্যা করিয়া ফেলিবে। শিশুটির নাম দেওয়া হইল ঘোষক।

পনের দিন পরে রত্নদত্তের গৃহিণী একটি পুত্র সন্তান প্রসব

করিল। তখন রত্নদত্ত ঘোষককে বধ করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইল। সোজাসুজি বধ করিলে পাছে রাজার রোষে পতিত হইতে হয়, সেই ভয়ে রত্নদত্ত কৌশল খুঁজিতে লাগিল। প্রথমে রত্নদত্তের নির্দেশে দাসী শিশুটিকে গোয়াল বাড়ীর দুয়ারে শোওয়াইয়া রাখিল। উদ্দেশ্য, ভোরবেলায় যখন গোরুগুলি বাহির হইবে, তখন নিশ্চয় তাহাদের পদতলে শিশুটির মৃত্যু হইবে। কিন্তু তাহা হইল না, প্রথমেই পালের প্রধান ষাঁড়টি বাহির হইয়া শিশুটিকে আগলাইয়া দাঁড়াইয়া থাকিল। সব গোরুগুলি একে একে চলিয়া গেলে সে শিশুটিকে ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

তারপর রত্নদত্ত ঘোষককে রাত্রিকালে রাজপথে ফেলিয়া রাখিল, ভাবিল শকট, অশ্ব কিংবা হস্তীর পদতলে নিশ্চয় সে মারা যাইবে। কিন্তু দেখা গেল, প্রাতঃকালে সে পথে শুইয়া হাসিতেছে। একটি কুকুর তাহাকে ঘিরিয়া শুইয়া আছে। তারপর রত্নদত্ত তাহাকে শ্মশানে ফেলিয়া দিয়া আসিল। কিন্তু শ্মশানের কুকুর, শৃগাল, শকুনি তাহাকে স্পর্শই করিল না। একটি শকুনি পাখার আড়ালে ছেলেটিকে আগলাইয়া রাখিল। তারপর ঘোষককে পর্বত হইতে ফেলিয়া দেওয়া হইল, তাহাতেও তাহার মৃত্যু হইল না। তখন রত্নদত্ত ঘোষককে কৌশলে অস্ত্র দ্বারা হত্যা করিবার চেষ্টায় থাকিল।

ঘোষক শ্রেষ্ঠীর বাড়ীতে প্রতিপালিত হইতে লাগিল। ক্রমে সে সাত আট বৎসরের বালক হইল। এদিকে এক বিপদ্ ঘটিল —শ্রেষ্ঠীর ছেলেটির সঙ্গে ঘোষকের এমন ভাব হইল যে, শ্রেষ্ঠীপুত্র এক মুহূর্তেও ঘোষককে ছাড়িয়া থাকিতে পারিত না।

দুইজনে একসঙ্গে খেলা করিত, একসঙ্গে উঠিত বসিত, এক সঙ্গে খাইত। দুইজনের মধ্যে যমজ ভাই-এর মত ভাব জন্মিল। রত্নদত্ত ভাবিল আর দেরী করা উচিত নয়। কিন্তু সুযোগ আর ঘটে না। ক্রমে ঘোষকের বয়স বারো বৎসর হইল।

রত্নদত্তের অনুগত এক কুম্ভকার ছিল। কুম্ভকার একবার হত্যার অপরাধে ধরা পড়িয়াছিল, রত্নদত্ত বহু টাকা দিয়া তাহাকে খালাস করিয়াছিল। কুম্ভকার নগরের প্রান্তে বাস করিতেছিল। কুম্ভকার জানিত, রত্নদত্ত তাহার পালিত পুত্রের প্রাণ হরণ করিতে চায়—কিন্তু সে ঠিক জানিত না, কোনটি পালিত পুত্র, কোনটি আত্মজ পুত্র। রত্নদত্ত একখানি চিটি দিয়া ঘোষককে কুম্ভকারের বাড়ীর দিকে পাঠাইয়া দিল। চিঠিতে লেখা ছিল, পত্রপাঠ পত্রবাহককে হত্যা করিয়া তোমার হাঁড়ী পুড়ানোর অগ্নিকুণ্ডে পুড়াইয়া ফেলিবে। এজন্য তোমাকে সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা পুরস্কার দেওয়া হইবে। ঘোষক পত্র লইয়া যাইতেছিল, পথে শ্রেষ্ঠিপুত্রের সঙ্গে দেখা হইল। শ্রেষ্ঠিপুত্র খেলায় হারিয়া কাঁদ কাঁদ হইয়া ঘোষককে বলিল—"ভাই তুমি আমার হয়ে খেলে ঋণ শোধ দাও। আমি পারছি না।"

ঘোষক বলিল—"আমি একখানা চিঠি নিয়ে সুদর্শন কুম্ভকারের বাড়ী যাচ্ছি, আমি এখন খেলতে পারব না।"

শ্রেষ্ঠিনন্দন বলিল—"আমি তোমার চিঠি নিয়ে যাচ্ছি, তুমি আমার হয়ে খেল।"

এই বলিয়া শ্রেষ্ঠিনন্দন চিঠিখানি লইয়া সুদর্শনের বাড়ীতে উপস্থিত হইল। কুম্ভকার শ্রেষ্ঠিনন্দনকেই ঘোষক বলিয়া

জানিত, পত্র পড়িয়া আর কোন সন্দেহ থাকিল না। তৎক্ষণাৎ অর্থলোভে কুম্ভকার শ্রেষ্ঠিনন্দনকে হত্যা করিয়া অগ্নিকুণ্ডে ফেলিয়া দিল।

রত্নদত্ত কিছুক্ষণ পরে বুঝিতে পারিল, কি সর্ব্বনাশ হইয়াছে। তখন সে নিজের কৃতকর্মের জন্য মাথার চুল ছিঁড়িয়া হাহাকার করিতে লাগিল। রত্নদত্ত বুঝিল—বিধাতার বিরুদ্ধে মানুষ কিছুই করিতে পারে না। অতঃপর শ্রেষ্ঠী ঘোষকের জীবনহরণের সঙ্কল্প ত্যাগ করিল। ঘোষক তাহার ভ্রাতাকে হারাইয়া দিনরাত কাঁদিত। এইভাবে কিছুকাল গেল।

ক্রমে ঘোষক বিশ বৎসরের বলিষ্ঠ যুবক হইয়া উঠিল। হঠাৎ রত্নদত্তের হত্যা-পিপাসা আবার জাগিয়া উঠিল। পঞ্চাশ ক্রোশ দূরে রত্নদত্তের একটি জমিদারি ছিল। যে কর্মচারীর উপর ঐ জমিদারির ভার ছিল সে একজন ভীষণ প্রকৃতির লোক। রত্নদত্ত ঠিক করিল যে, তাহার দ্বারাই ঘোষকের হত্যা সাধন করিতে হইবে। একখানি পত্র লিখিয়া রত্নদত্ত ঘোষককে ঐ কর্মচারীর কাছে পাঠাইল। পত্রে লেখা থাকিল—পত্র-বাহককে হত্যা করিয়া আমাকে সংবাদ পাঠাইবে। ঘোষক পত্র লইয়া যাত্রা করিল।

চল্লিশ ক্রোশ দূরে একজন শ্রেষ্ঠী থাকিতেন—তাঁহার নাম মণিকণ্ঠ। মণিকণ্ঠ রত্নদত্তের আত্মীয়। ঘোষক মণিকণ্ঠের গৃহে রাত্রিকালে আশ্রয় লইল। মণিকণ্ঠ গৃহে ছিল না—তাহার স্ত্রী পরিচয় পাইয়া ঘোষককে আদর করিয়া অন্তঃপুরে লইয়া গেল। আহারান্তে ক্লান্ত ঘোষক ঘুমে একেবারে অচেতন হইয়া পড়িল।

মণিকণ্ঠের একটি অবিবাহিত কন্যা ছিল—তাহার নাম

কমলা। কমলা যেমন বুদ্ধিমতী, তেমনি সুশিক্ষিতা। সে লক্ষ্য করিল যে, ঘোষকের উড়ুনিতে একখানি পত্র বাঁধা আছে। ঘোষক ঘুমাইয়া পড়িলে কমলা তাহার কক্ষে ঢুকিয়া আস্তে আস্তে পত্রখানি খুলিয়া নিজের কক্ষে গিয়া পড়িয়া দেখিল। চিঠি পড়িয়া তাহার মাথা ঘুরিয়া গেল। এমন সুন্দর ছেলেটিকে মারিয়া ফেলিবার জন্য শ্রেষ্ঠী তাহার কর্মচারীকে কি করিয়া আদেশ দিল ভাবিয়া পাইল না! কমলা চিঠিখানি ছিঁড়িয়া ফেলিয়া এক-খানি চিঠি জাল করিল। সে জাল চিঠিতে এইরূপ লিখিল যে, 'আমার পালিত পুত্র ঘোষককে তোমার কাছে পাঠাইলাম। আমার আত্মীয় মণিকণ্ঠের কন্যার সহিত ইহার বিবাহ দিবে এবং তাহাকে আমার জমিদারিতে একটি ভাল বাড়ী নির্মাণ করিয়া দিবে। ঘোষক জমিদারিতে থাকিয়া জমিদারির কাজকর্ম শিখিবে।'

কমলা এই চিঠিখানি ঘোষকের চাদরে বাঁধিয়া দিল। ঘোষক ঐ চিঠি লইয়া জমিদারিতে গেল। কয়েক দিনের মধ্যেই ঘোষকের বিবাহ হইল—প্রকাণ্ড বাড়ীতে বরকন্যা মনের আনন্দে বাস করিতে লাগিল। রত্নদত্ত যখন এসংবাদ শুনিল, সে তখন একেবারে মুহ্যমান হইয়া পড়িল। ক্রমে রত্নদত্ত শয্যা গ্রহণ করিল এবং তাহাকে নানা রোগে ধরিল। রত্নদত্ত ঘোষকের কাছে লোক পাঠাইয়া জানাইল, "আমি বড়ই পীড়িত; তোমরা শীঘ্র এস।"

কমলা কৌশাম্বীর বার্তাবাহককে ঘোষকের সঙ্গে দেখা করিতেই দিল না। বুদ্ধিমতী কমলা বুঝিল যে, এখনও শেষ সময় উপস্থিত হয় নাই। আবার কয়েকদিন পরে আর একজন লোক আসিল, কমলা তাহাকেও অপেক্ষা করিতে বলিল। ঘোষক একথাও জানিতে পারিল না। তৃতীয় বারে যখন দূত আসিল,

তখন কমলা তাহাকে বারবার প্রশ্ন করিয়া বুঝিল যে, আর দেরি বেশি নাই। তখন ঘোষককে শ্রেষ্ঠীর পীড়ার সংবাদ জানাইল এবং বহু লোকজন লইয়া কৌশাম্বী যাত্রা করিল।

পথে অযথা দেরি করিয়া কমলা ও ঘোষক যখন কৌশাম্বীতে উপস্থিত হইল—তখন শ্রেষ্ঠীর শেষ সময় উপস্থিত। শ্রেষ্ঠীর শয্যাপার্শ্বে ঘোষক ও কমলা গিয়া দাঁড়াইল, চারিপাশে আত্মীয় বন্ধু ও কর্মচারিগণ বসিয়া আছে। রত্নদত্তের ঘোষককে কিছুই দেওয়ার ইচ্ছা ছিল না, পাছে ঘোষক মৃত্যুর পর শ্বশুরের সাহায্যে সব অধিকার করে, তাই কে কি পাইবে মৃত্যুকালে সে বলিয়া যাইতে চায়। শ্রেষ্ঠী বলিল,—'আমার সম্পত্তির দুই আনা পাইবে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র, দুই আনা পাইবে আমার দুই ভাগিনেয়, আর বাকী পাইবে ঘোষকের স্ত্রী,' এই কথা বলিয়াই রত্নদত্ত ভুল সংশোধনের জন্য আবার যেমন মুখ খুলিয়াছে, অমনি কমলা রত্নদত্তের বুকে মাথা রাখিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল এবং বলিতে লাগিল—"বাবা আপনিই যদি চললেন, আমি ধনসম্পত্তি নিয়ে কি করব? বাবা, আমি হতভাগিনী, আপনার সেবাযত্ন করতে পেলাম না, আপনার সম্পত্তির চেয়ে আপনার স্নেহ আমার কাছে অনেক দামী।"

এইভাবে চীৎকার করিয়া সে এমন গোলমাল বাধাইয়া দিল যে, শ্রেষ্ঠী পরে কি বলিল বা বলিতে চাহিল তাহা কেহ বুঝিতেই পারিল না। ঐ গোলমালের মধ্যে শ্রেষ্ঠী প্রাণত্যাগ করিল। শ্রেষ্ঠীর বলিবার কথা ছিল যে, 'বাকী আমার স্ত্রী পাইবে।' কমলা বুঝিয়াছিল শ্রেষ্ঠী ভুল করিয়াছে, তাই কিছুতেই সে ভুল আর সংশোধন করিতে দিল না।

যেমন কর্ম তেমনি ফল

বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের এক পুরোহিত ছিল, তাহার গায়ের রঙ ছিল পিঙ্গল, চুলগুলি ছিল কটা, চোখ দুটিও ছিল কটা এবং দাঁতগুলি বাহির হইয়া থাকিত। এই ব্যক্তি খুব পণ্ডিত ছিল, কিন্তু ইহার রুচি ছিল অতি হীন, প্রবৃত্তি ছিল ইতর, প্রকৃতি ছিল ক্রূর।

ইহার সঙ্গে আর একজন ব্রাহ্মণের বড়ই শত্রুতা ছিল, তাহার চেহারাও ছিল ইহারই মতন। রাজদণ্ড এড়াইয়া কি করিয়া তাহার প্রাণবিনাশ করা যায়, এই চিন্তায় পুরোহিতের ঘুম হইত না।

পুরোহিত দেখিল যে, রাজা একটা খুব বড় রকমের যাগযজ্ঞ না করিলে অথবা একটা বৃহৎ অনুষ্ঠান কিছু না করিলে তাহার অর্থবল বৃদ্ধির সুবিধা নাই। এক ঢিলে দুই পাখী মারিবার জন্য পুরোহিত রাজাকে বলিল—"রাজন, আপনার পুরী বড়ই সুলক্ষণাক্রান্ত, কিন্তু শাস্ত্রপাঠে দেখলাম যে আপনার পুরীর দক্ষিণ দ্বারটি বড়ই অশুভসূচকভাবে গঠিত। ওটা ভেঙ্গে ওর স্থলে নবদ্বার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এই উদ্দেশ্যে উপযুক্ত একটি বিরাট যজ্ঞ করতে হবে এবং নগরদেবতাগণের যথাযোগ্য পূজা দিতে হবে।"

মহারাজ বলিলেন—"যা যা কর্তব্য আপনি করুন। আমি মন্ত্রিগণকে আপনার উপদেশমত সমস্ত ব্যবস্থা করতে বলে দিচ্ছি।"

নবদ্বার প্রতিষ্ঠার জন্য নগরময় বিরাট আয়োজন হইতে লাগিল, নগরে যজ্ঞাদি অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল, নগরদেবতাদের পূজা হইতে লাগিল। পুরোহিত প্রচুর দক্ষিণা ও নিজের রচিত তালিকা অনুযায়ী বহু দ্রব্য লাভ করিতে লাগিল।

পুরোহিত রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া বলিল—"কল্য নবদ্বারের ভিত্তিস্থাপনের শুভ দিন। কালই দ্বারের ভিত্তি স্থাপিত যাতে হয় তাই করুন। নতুবা অকাল পড়বে—দুই বৎসরের আগে আর শুভদিন নেই। কিন্তু শাস্ত্রে এই দ্বারপ্রতিষ্ঠার সম্বন্ধে বিধান আছে যে, একজন পিঙ্গল বর্ণের কপিলকেশ দন্তুর ব্রাহ্মণকে বলিদান দিয়ে তার মৃতদেহের উপর ঐ দ্বারের ভিত্তি স্থাপন করতে হবে। এইভাবে তোরণের প্রতিষ্ঠা হলে কখনও কোন শত্রু এ দ্বার অতিক্রম করে পুরীতে প্রবেশ করতে পারবে না।"

রাজা বলিলেন—"এইরূপ ব্রাহ্মণ নগরে কে আছেন খোঁজ করুন।"

পুরোহিত বলিল—"হ্যাঁ, আমি সন্ধান জানি। একজন এইরূপ ব্রাহ্মণ, উত্তরতোরণের নিকটে যে মহাকালের মন্দির আছে সেই মন্দিরের পুরোহিতের কাজ করে। আপনি কাল প্রাতেই তাকে ধরে এনে বন্দী করে রাখবেন। তাকে উৎসর্গ ক'রে তার মৃতদেহের উপর দ্বারের ভিত্তি স্থাপিত হবে। আজ আর প্রকাশ করবেন না—তাহলে পালিয়ে যেতে পারে। কাল সূর্যোদয়ের আগেই সৈনিকদের পাঠিয়ে তাকে ধরে আনবেন।"

রাজা—তাই হবে। আপনি অন্যান্য অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করুন।

পুরোহিত মনের আনন্দে গদ্‌গদ হইয়া বাড়ী আসিল। কিন্তু তাহার গৃহিণীকে এই সংবাদটি না জানাইয়া সে থাকিতে পারিল না।

গৃহিণী এই সংবাদ পাইয়া কিছুতেই চাপিয়া রাখিতে পারিল না, সে তাহার অতি বিশ্বস্ত দাসীকে বলিল—"কাল আমাদের শত্রুনিপাত হবে। মহাকালের মন্দিরের কটাব্রাহ্মণের কাল বলিদান হবে।"

দাসী জল আহরণ করিতে গিয়া ইহা তাহার সখীকে বলিল। এইভাবে ক্রমে কথাটা কটা বামুনের কানেও গেল। সে গভীর রাত্রে স্ত্রীপুত্র লইয়া নগর ত্যাগ করিয়া পলাইল—নগরে আরও দুই-একজন এইরূপ চেহারার ব্রাহ্মণ ছিল, তাহাদেরও সংবাদ দিল। তাহারাও সব পলাইয়া গেল।

প্রাতে সৈনিকগণ আসিয়া রাজাকে সংবাদ দিল কটা বামুন পলাইয়াছে।

রাজা বলিলেন—"সমস্ত নগর খুঁজে দেখ এরূপ বামুন আর পাওয়া যায় কিনা।"

তাহারা দ্বিপ্রহর বেলায় আসিয়া জানাইল নগরে যত কটা বামুন ছিল সব রাত্রিকালে চম্পট দিয়াছে।

রাজা তখন বলিলেন—"তবে উপায়! সবই পণ্ড হল দেখছি। তোমরা সমগ্র রাজ্য খুঁজে দেখ, এরূপ ব্রাহ্মণ পেলেই ধরে নিয়ে এস।"

মন্ত্রী বলিলেন—"আজই শুভদিন। পুরোহিত বলেছেন দুই বৎসরের মধ্যে আর শুভদিন নেই। আজই যে দরকার। আজ তো আর নগরের বাইরে থেকে খুজে আনা যায় না।"

রাজা বলিলেন—"তবে আর উপায় কি? দুই বৎসর পরেই তা হবে।"

মন্ত্রী—তা কি ক'রে হয়! এ দ্বার কি এতদিন উন্মুক্ত রাখা যায়? এ দ্বার প্রতিষ্ঠিত না হলে রাজ্যের মহা অনিষ্ট হ'তে পারে। পুরোহিত বলেছেন যে, দেরী করা চলবে না। আজই এর প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

রাজা—পিঙ্গলবর্ণের দন্তুর ব্রাহ্মণ তো চাই।

মন্ত্রী—এরূপ ব্রাহ্মণ একজন রাজপুরীতেই তো আছে। আপনার পুরোহিতই এরূপ চেহারার ব্রাহ্মণ।

রাজা—পুরোহিতকে তো আর বলি দিতে পারি না।

মন্ত্রী—তা ছাড়া উপায় কি? তাঁকেই বলি দিতে হয়। রাজ্যরক্ষা তো করতে হবে। যে লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয়িত হল, এই যে ছয়মাস ধরে এত অনুষ্ঠান, এত সমারোহ সবই কি পণ্ড হবে?

রাজা—পুরোহিতকে বলি দিলে পুরোহিত কোথায় পাবেন?

মন্ত্রী—কেন, তাঁর শিষ্য তর্কারিক রয়েছেন। তিনি আরও পণ্ডিত, সদাচারী, নিষ্ঠাবান, নির্লোভ ব্রাহ্মণ। তিনিই পৌরোহিত্য করবেন। শুভদিন তো ছাড়া যায় না!

রাজা—যা ভাল হয় করুন। মোট কথা অনুষ্ঠানের কোন ত্রুটি যেন না হয়। পুরোহিত বলেছেন যতদিনে নবদ্বার প্রতিষ্ঠিত না হবে ততদিন আমার উপর থেকে শনির দৃষ্টি যাবে না।

মন্ত্রী মনে মনে বলিলেন—"জাবন্ত শনিরই আজ জীবনান্ত ঘটবে, কে আর দৃষ্টি দেবে?"

মন্ত্রী পুরোহিতকে বন্দী করিয়া দক্ষিণদ্বারে লইয়া যাইতে

বলিলেন। পুরোহিত বন্দী হইয়া সারা নগর আর্তনাদে প্রকম্পিত করিয়া চলিতে লাগিল।

তর্কারিক নিজের গুরুকে এই দশায় দেখিয়া বড়ই ক্ষুব্ধ হইলেন। মনে মনে ভাবিলেন ইহাকে কোন প্রকারে বাঁচাইতে হইবে।

তর্কারিক অনুচরগণকে বলিলেন—"রাত্রির শেষ প্রহরে শুভক্ষণ আছে, সেই সময় ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তোমরা সারা রাত্রি পানভোজন করতে থাক।"

তর্কারিক তখন পুরোহিতকে বলিলেন—"গুরুদেব, একি আপনার দুর্বুদ্ধি হ'ল বলুন! কোন শাস্ত্রে এ-সব আছে? রাজা নিজে শাস্ত্রের খোঁজ রাখেন না ব'লে কি এমন করে প্রবঞ্চনা করতে হয়? মিছামিছি রাজার এত অর্থব্যয় ঘটালেন, তাঁর মনে উদ্বেগের সৃষ্টি করালেন এবং এমন চমৎকার সুন্দর দক্ষিণ তোরণটিকে ভাঙ্গালেন! এ-ত গেল অর্থলোভে। অপরের প্রাণবিনাশের প্রবৃত্তি আপনার মত বিজ্ঞ ব্যক্তির মনে কি করে জাগল—ভেবে পাই না। ছি, ছি, কি লজ্জার কথা! এখন নিজের জীবনই তো দণ্ডস্বরূপ দিতে হচ্ছে।"

পুরোহিত বলিল—"বাছা তর্কারিক, আমাকে কোন প্রকারে বাঁচাও। সবই যে মিথ্যা তাতো তুমি জান, তুমি আমাকে প্রাণে বাঁচাও। তোমার পায়ে পড়ি, গুরুর প্রাণরক্ষা কর।"

তর্কারিক বলিলেন—"দেখি কি করতে পারি। বড়ই কঠিন ব্যাপার। হয়ত আমাকেই জীবন দিতে হবে।"

সারা রাত্রি পানভোজন করিয়া যখন অনুচরগণ ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, তখন তর্কারিক পুরোহিতকে বন্ধন মুক্ত করিয়া বলিলেন

—"আপনি এইবার দূর দেশে পলায়ন করুন। এদিকে আর আসবেন না।"

তারপর তর্কারিক মহিষ, ছাগ ইত্যাদির রক্তে মন্দির রাজপথ ও তোরণকে সিক্ত করিয়া ছাগমহিষের মৃতদেহ গর্তের মধ্যে পুঁতিয়া সকলকে জাগাইয়া বলিলেন—"শুভ সময় উপস্থিত, তোমরা বাদ্য বাজাও, শঙ্খধ্বনি কর।"

স্থপতিকে বলিলেন—"ভিত্তি স্থাপন কর, পুরোহিতের মৃতদেহ এখানে প্রোথিত আছে। জহ্লাদ ও সৈনিকগণ পুরোহিতের মুণ্ড নিয়ে মহাকালের মন্দিরে গিয়েছে। তোমরা সকলে ভিত্তির উপর পুষ্পচন্দন বর্ষণ করো।"

রাজা আসিবার আগেই ভিত্তি কয়েক হাত উঠিয়া গেল। সারাদিনের মধ্যে পুরদ্বার নির্মিত হইয়া গেল।

তর্কারিক কিছুদিন পরে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন। উত্তর তোরণের পিঙ্গলকেশ ব্রাহ্মণ নগরে ফিরিয়া আসিলেন। তিনিই রাজপুরোহিতের পদ লাভ করিলেন। রাজা ভূতপূর্ব পুরোহিতের স্ত্রীপুত্রের জন্য একটা বৃত্তি নির্দেশ করিয়া দিলেন।

ভক্তের ভগবান

দক্ষিণাপথে বিদ্যানগরের দুই ব্রাহ্মণ একবার বৃন্দাবনে তীর্থ-পর্যটনে গিয়াছিল। ইহাদের মধ্যে একজন ছিল বৃদ্ধ, আর একজন ছিল যুবক। যুবক ব্রাহ্মণটি সমস্ত পথ বৃদ্ধের সেবা করিতে লাগিল। বৃন্দাবনে পৌঁছিয়াও যুবকটি সঙ্গে থাকায় বৃদ্ধের কোনরূপ অসুবিধা হইল না। বৃন্দাবনে বৃদ্ধ হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়িলে যুবকটি সারা দিনরাত তাহার সেবা করিল।

বৃন্দাবনে থাকিবার সময়ে প্রত্যহ দুইজনে গোপালের মন্দিরে যাইত। একদিন গোপালের মন্দিরে বসিয়া দুইজনে গল্প করিতেছে, বৃদ্ধ কথায় কথায় বলিয়া ফেলিল, "দেখ, তুমি যেরূপ সেবা করলে আমার নিজের ছেলেমেয়েও তা করেনি। ইচ্ছা হয় তোমাকে চিরদিনের মত আপনার ক'রে রাখি। দেশে ফিরে আমার কন্যার সঙ্গে তোমার বিবাহ দেব।"

যুবক বলিল—"মন্দিরে ব'সে এসব কথা ব'লে ভাল করলেন না। কারণ, আপনি জাত্যংশে আমার চেয়ে অনেক বড়—আমার কুলগৌরব নেই। দেশে ফিরে কিছুতেই আপনি আমাকে কন্যাদান করবেন না। কেন মিছামিছি গোপালকে সাক্ষী ক'রে এমন সঙ্কল্প করলেন?"

বৃদ্ধ—আমার যা কথা, তাই কাজ। আমি কুলশীল মানি না। তোমার মত গুণবান জামাতা আমি কুলীনবংশে কোথায় পাব?

যুবক—আপনার পুত্র পরিজন আছে, তাদের সঙ্গে পরামর্শ না করেই প্রতিজ্ঞা করলেন। তারা বাধা দিলে কি করবেন?

বৃদ্ধ—বল কি ! আমার কন্যাকে আমি যেখানে খুসী বিয়ে দেব, তাদের কথা শুনব কেন ?

যুবক চুপ করিয়া থাকিল। দেশে দুইজনে ফিরিয়া আসিল। দুইমাস পরে বৃদ্ধ ছেলেদের কাছে প্রস্তাব করিল—"শ্রীমতীর সঙ্গে মাধবের বিয়ে দিতে চাই। মাধব তীর্থপথে যে সেবা করেছে তা তোমরা কখনও করনি। আমি তাকে কন্যা দান করব বলে প্রতিশ্রুত আছি।"

বৃদ্ধ যাদবের স্ত্রী পুত্র সকলেই হুঙ্কার দিয়া উঠিল, বলিল—"নীচ-কুলে আমারা শ্রীমতীকে কিছুতেই দেব না। মেয়েকে তুঙ্গভদ্রার জলে ভাসিয়ে দেব, তবু মাধবকে দেব না।"

বৃদ্ধ বলিল—"আমি যে তীর্থস্থানে প্রতিশ্রুত আছি।"

জ্যেষ্ঠ পুত্র অচ্যুত বলিল—"কেন তুমি আমাদের জিজ্ঞাসা না করে প্রতিশ্রুতি দিলে ? ও প্রতিশ্রুতির কোন দাম নেই। হয়ত খুব রোগে পড়েছিলে, কায়দায় পেয়ে প্রতিশ্রুতি করিয়ে নিয়েছে। নয়ত তোমাকে ভাঙ খাইয়ে ভুলিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়েছে। ও প্রতিশ্রুতি মানবার প্রয়োজন নেই। তোমার সেবা করে থাকে, ওকে দু'বিঘে জমি দাও, কিছু টাকাকড়ি দাও। মেয়েটিকে দেওয়া হবে না।"

বৃদ্ধ চুপ করিয়া রহিল। ক্রমে ছয়মাস অতীত হইলে মাধব একদিন আসিয়া যাদবের প্রতিশ্রুতিমত কন্যা প্রার্থনা করিল। যাদবের পুত্র অচ্যুত রাগিয়া উঠিয়া বলিল—"তোমার এত বড় স্পর্দ্ধা ! তুমি নীচকুলের লোক হ'য়ে আমার ভগিনীকে বিয়ে করতে চাও ! ফের যদি ও কথা মুখে আন তাহলে তোমাকে গ্রাম থেকে মেরে তাড়াব।"

মাধব—তোমার পিতা প্রতিশ্রুত আছেন ব'লেই প্রার্থনা করছি, নইলে আমার সাহস হ'ত না।

অচ্যুত—কে বলল প্রতিশ্রুত আছেন? কেউ সাক্ষী আছে?

মাধব—সাক্ষী আছেন বৈ কি! বৃন্দাবনের গোপালদেবই সাক্ষী।

অচ্যুত—সে আবার কে?

মাধব—বৃন্দাবনের দেবতা স্বয়ং শ্রীগোপাল ঠাকুর।

অচ্যুত—ও, তাই নাকি! তবে তো ভারী সাক্ষী! গোপাল-ঠাকুর নিজে সাক্ষ্য দিতে আসবেন?

মাধব—হ্যাঁ, আসবেন।

অচ্যুত—বল কি? যাও, তাঁকে নিয়ে এস। তিনি সাক্ষ্য দিলে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা হ'বে।

এই বলিয়া অচ্যুত হাসিতে হাসিতে গিয়া পিতাকে বলিল—"তোমার মাধব বলে যে, সে গোপালকে নিয়ে এনে সাক্ষ্য দেওয়াবে। বাবা, এত বড় হাবাবোকার হাতে তুমি মেয়ে দেবে?"

সকলেই হাসিতে লাগিল। যাদব কেবল হাসিল না। তাহার সর্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। সে জানে—'ভগবান স্বয়ং সত্যস্বরূপ, তিনি চিরদিন সত্যবাদীর সহায়। শেষ পর্যন্ত তিনি সত্যকেই জয়ী করবেন, সত্যের মর্যাদা তিনি রক্ষা করবেন। এ জগতে মিথ্যার সাক্ষী অনেক মেলে, কিন্তু সত্যের সাক্ষী মেলা দুষ্কর। যে সত্যের কোন সাক্ষী নেই, সে সত্যের সাক্ষী স্বয়ং ভগবান।'

মাধব বৃন্দাবন যাত্রা করিল। যাদব দিনরাত গোপালের চরণ ধ্যান করিতে লাগিল—"প্রাণের গোপাল, তুমি আমার মুখ রক্ষা কর।"

মাধব গোপালের মন্দিরে গিয়া ধরনা দিয়াছিল। একমাস অতীত হইল, গোপালের সাড়াশব্দ নাই। একমাস পরে এক-দিন গভীর রাত্রে মন্দির হইতে মধুরকণ্ঠে কে যেন বলিল—"মাধব, তুমি কি চাও ?"

মাধব—আপনি কে বলুন, তবে বল্‌ব।

গোপাল—আমি বৃন্দাবনের গোপাল, বল তুমি কি চাও ?

মাধব—আট-নয় মাস আগে আমার সঙ্গী এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তোমার মন্দিরে প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন যে, আমাকে তাঁর কন্যা দান করবেন বলে। তোমার মনে পড়ে, ঠাকুর ?

গোপাল—হ্যাঁ, খুব মনে পড়ে। তুমি বললে মন্দিরে বসে প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভাল করলেন না, বাড়ী গিয়ে আপনার মত বদলে যাবে।

মাধব—তাই গিয়েছে। এখন তাঁর ছেলে বলে, প্রতিশ্রুতির সাক্ষী কে আছে ? আমি তোমার নাম করলাম ঠাকুর। তাতে তারা বললে, 'নিয়ে এস তোমার সাক্ষীকে।' আমি তোমায় নিয়ে যাওয়ার জন্য এসেছি ! তোমারও না গেলে চলবে না। আমার মুখ রক্ষা হয় না ঠাকুর।

গোপাল—মাধব, আমি তো জীবন্ত নই। আমি তো পাথরের বিগ্রহ। আমি কেমন করে যাব ?

মাধব—তুমি জীবন্ত নও তো কথা বলছ কি করে ? তোমার কোন ওজর আমি শুনব না। তোমাকে যেতেই হবে।

গোপাল—তুমি আমাকে একটি পাল্কী ক'রে নিয়ে চল না কেন ?

মাধব—দেখ দেখি আব্দার ! আমি গরীব মানুষ, পাল্কী

কোথায় পাব ? আর তুমি বুড়ো না রোগী যে, তোমাকে পাল্কী ক'রে নিয়ে যেতে হবে ? আর যদি পাল্কীই যোগাড় করি—তোমাকে ঘাড়ে করে সেই পাল্কীতে তুলতে হবে, তখন পূজারীরা আমাকে মেরে ফেলবে। তোমাকে নিয়ে যেতে দেবে কেন ? ওসব বাজে কথা শুনতে চাই না। আমার সঙ্গে হেঁটেই তোমাকে যেতে হবে।

গোপাল—আচ্ছা তাই যাব। তুমি আগে আগে যাবে, আমি পিছু পিছু যাব, যদি সন্দেহ করে পিছু পানে তাকাও, তবে আমি আর চলব না।

মাধব—আচ্ছা, তাই হবে। কিন্তু তুমি যাচ্ছ, কি না যাচ্ছ, জানব কি করে ?

গোপাল—তুমি আমার নূপুরের শব্দ শুনতে পাবে। পিছু পানে তাকিও না যেন।

গভীর রাত্রে মাধব গোপালকে সঙ্গে লইয়া যাত্রা করিল। সমস্ত পথ নূপুরের শব্দ শুনিতে শুনিতে মাধব গ্রামের সন্নিকটে আসিয়া পৌঁছিল। গ্রামের মাঠে আসিয়া মাধব আর নূপুরের শব্দ শুনিতে পাইল না। ভয় পাইয়া পিছু পানে তাকাইল, অমনি গোপাল দাঁড়াইয়া গেলেন।

মাধব বলিল—"দাঁড়ালে কেন, এইত সম্মুখেই গ্রাম।"

গোপাল—মাধব, আমি তো বলেছিলাম, পিছুপানে তাকালে আর আমি চলব না।

মাধব—তোমার নূপুরের শব্দ না পেয়ে ভাবলাম তুমি আসছ না। তাই পিছুপানে তাকালাম।

গোপাল—নূপুরে বালি ঢুকে বাজনা বন্ধ হয়েছে, আমি

ঠিকই চলছিলাম। যাক্, এতেই তোমার কাজ হবে। তুমি যাদবের বাড়ীর সকলকে ডেকে আন।

মাধব প্রভাতে গ্রামে পৌঁছিয়া যাদবকে বলিল—"গোপাল সাক্ষ্য দিতে এসেছেন, গ্রামের বাইরে অপেক্ষা করছেন। তোমরা এসে দেখ।"

গোপালকে আর কথা বলিয়া সাক্ষ্য দিতে হইল না। মাঠের মধ্যে পূজার্চনার ধূম পড়িয়া গেল। বিদ্যানগরের রাজা সেখানে একটি প্রকাণ্ড মন্দির গড়িয়া দিলেন। নিত্যসেবার জন্য দেবোত্তর সম্পত্তি দান করিলেন।

বহুদিন পর্যন্ত গোপাল এই মন্দিরেই ছিলেন। তারপর উৎকলের রাজা বিদ্যানগর জয় করিয়া গোপালদেবকে পুরীধামে লইয়া আসেন। পুরীর নিকটে তাঁহার সেবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। যে গ্রামে গোপালের মন্দির গঠিত হইয়াছে, তাহাকে 'সত্যবাদী গ্রাম' বলে।

তৃষ্ণা

বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের দুই পুত্র ছিল। এক পুত্র ছিলেন যুবরাজ। অন্য পুত্র ছিলেন সেনাপতি।

রাজার মৃত্যু হইলে অমাত্যগণ জ্যেষ্ঠকুমারকে সিংহাসনে আরোহণ করিতে অনুরোধ করিল।

তিনি বলিলেন—"আমি রাজ্য চাই না, ভাই রাজ্য গ্রহণ করুক।"

অমাত্যগণ বলিলেন—"তবে আপনি উপরাজ হয়ে রাজ্য শাসন করুন।"

জ্যেষ্ঠকুমার বলিলেন—"না, আমি উপরাজত্বও চাই না।"

অমাত্যগণ বলিলেন—"তবে আপনি প্রধান সচিব হয়ে আপনার ভ্রাতাকে উপদেশ দিন।"

কুমার তাহাতেও রাজী হইলেন না।

কনিষ্ঠকুমার তখন বলিলেন—"দাদা আপনি তবে রাজপুরীতে অথবা রাজ্যের অন্যত্র স্বচ্ছন্দে নিশ্চিন্তে বাস করুন, আপনার যত ধনের প্রয়োজন সমস্তই রাজকোষ থেকে গ্রহণ করুন।"

জ্যেষ্ঠকুমার বলিলেন—"ভাই, আমার মন সংসারে নেই, আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করব।"

ভ্রাতা কত কাকুতি মিনতি করিলেন, জননী কত কান্নাকাটি করিলেন, কুমারকে কিছুতেই ফিরাইতে পারিলেন না। তিনি দণ্ডচীবর ধারণ করিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন।

প্রথমে তিনি লোকালয়ের বাহিরে গিয়া কিছুকাল বাস

করিলেন। কিন্তু তাহাতে তাঁহার শরীর জীর্ণ হইতে লাগিল। তখন তিনি লোকালয়ে আসিয়া ভিক্ষা করিয়া জীবিকা উপার্জন করিতেন এবং দেবদেউলে শুইয়া থাকিতেন। ক্রমে তাঁহার ভিক্ষার ক্লেশও অসহ্য হইল, তখন তিনি পিতৃদেবের সীমান্ত প্রদেশ একজন শ্রমজীবী হইয়া জীবিকা অর্জন করিতে লাগিলেন।

ক্রমে তাঁহার মনে হইল যদি পরিশ্রম করিয়াই অন্নার্জন করিতে হয়, তবে শ্রমজীবী হইয়াই বা কেন করি? কোন উৎকৃষ্ট বৃত্তি গ্রহণ করি না কেন? এই ভাবিয়া তিনি একজন শ্রেষ্ঠীর অধীনে কর্ম গ্রহণ করিলেন। তিনি যে স্বয়ং রাজপুত্র—একথা বেশীদিন গোপন থাকিল না। শ্রেষ্ঠী সে কথা জানিতে পারিয়া তাঁহাকে সমাদরের সহিত প্রতিপালন করিতে লাগিলেন।

কুমার বিনা পরিশ্রমে গুরুর আদরে শ্রেষ্ঠীর ভবনে থাকিয়া গেলেন। তিনি যে অঞ্চলে ছিলেন, সে অঞ্চলের লোকেরা তাঁহার কাছে আসিয়া আবেদন করিল—'আমাদের অত্যন্ত বেশি কর দিতে হয়। আপনি মহারাজকে বলে আমাদের রাজস্ব কমিয়ে দিন।'

কুমার ভ্রাতাকে পত্র লিখিয়া তাহাদের রাজস্ব কমাইয়া দিলেন।

এ প্রদেশের লোকে যখন শুনিল যে, কুমার কতকগুলি প্রজার রাজস্ব কমাইয়া দিয়াছেন তখন দলে দলে প্রজারা আসিয়া বলিতে লাগিল—'আমাদেরও রাজস্ব কমিয়ে দিন। আপনাকে অর্ধেক রাজস্ব দেব, আর বাকী অর্ধেক মাফ করিয়ে দিন।'

কুমার ভ্রাতাকে পত্রদ্বারা জানাইলেন—'এদেশের লোক আমাকেই রাজস্ব দেবে, এদের রাজস্ব তুমি গ্রহণ করো না।'

রাজা তাহাতেই সম্মত হইলেন।

ক্রমে কুমারের তৃষ্ণা বাড়িতে লাগিল। তিনি এখন রাজকুমারের মতই মহাসমারোহে জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। তিনি ভ্রাতার কাছে উপরাজ্য ও রাজপ্রতিনিধির পদ চাহিয়া পাঠাইলেন। কনিষ্ঠকুমার প্রসন্নচিত্তে সানন্দে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে উপরাজের পদ দান করিলেন।

কিছুকাল এইভাবে চলিতে লাগিল। ইহাতেও কুমার তৃপ্ত হইলেন না। ইতিমধ্যে কুমার অনেকগুলি বিবাহ করিয়াছেন, সন্তানাদি জন্মিয়াছে। তাহাদের জন্য রাজ্যের পরিমাণ বাড়ানো প্রয়োজন। কুমার একদিন সৈন্যসামন্ত লইয়া বারাণসীপুরী অবরোধ করিয়া ভ্রাতাকে লিখিয়া পাঠাইলেন—'হয় রাজ্য ছেড়ে দাও, নয় যুদ্ধ দাও।'

কনিষ্ঠকুমার আসিয়া জ্যেষ্ঠের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন—"আপনার রাজ্য আপনি গ্রহণ করবেন, তার জন্য আবার যুদ্ধ কেন? আমি তো আপনাকে রাজ্যচ্যুত করি নি।"

কুমার সিংহাসন অধিকার করিলেন, ভ্রাতাকে উপরাজের পদ অর্পণ করিলেন। রাজ্যপ্রাপ্তির পর কুমারের মনে হইল যে, তাঁহার রাজ্য অতি ক্ষুদ্র, রাজ্য-বিস্তার করার প্রয়োজন। তখন তিনি সৈন্যদল বাড়াইতে লাগিলেন এবং পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলি জয় করিতে লাগিলেন। কিন্তু কেবলই তাঁহার মনে হইতে লাগিল যে, ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যগুলি কি করিয়া জয় করিয়া ভারতের একচ্ছত্রাধিপত্য সম্রাট হওয়া যায়।

একদিন এই চিন্তায় বিভোর আছেন, এমন সময় রাজাকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য স্বয়ং শক্রদেব মানবমূর্তি ধরিয়া তাঁহার

কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। রুদ্ধকক্ষের মধ্যে একজন দিব্যদেহ পুরুষের আবির্ভাবে রাজা চমকিয়া উঠিলেন।

দিব্যপুরুষ বলিলেন—'মহারাজ, ভয় নেই। রক্ষ নই, যক্ষ নই, আমি একজন দেবপুরুষ। আপনি নতুন রাজ্যের জন্য ব্যাকুল হয়েছেন—আমি তিনটি রাজ্যের সন্ধান দিচ্ছি। সেই তিনটি রাজ্য আপনি একে একে জয় করুন, আমি নিজের দৈবী শক্তি বলে আপনাকে বিজয়ী করব। আপনি অচিরে যুদ্ধসজ্জা করুন, আপনার বলাবল কি আছে এখনি সেনাপতিকে ডেকে সন্ধান নিন।"

এই কথা শুনিয়াই রাজা কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া দরবারে আসিয়া সেনাপতিকে ডাক দিলেন। সেনাপতি আসিলে তিনি দিব্যপুরুষের কথা বলিলেন।

সেনাপতি বলিলেন—"আপনি রাজ্য তিনটির নাম তো জেনে নিয়েছেন?"

রাজা—না, তা তো জিজ্ঞাসা করিনি।

সেনাপতি—দেবপুরুষকে যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করেছিলেন? তাঁর সেবা পরিচর্য্যা কিছু করেছিলেন?

রাজা—না, তাতো কিছু করিনি।

সেনাপতি—তিনি কোথায়? তাঁকে সব জিজ্ঞাসা করুন, তাঁর সেবা পরিচর্য্যা করুন, তাঁকে পরিতুষ্ট করুন। বলাবলের কথা পরে হবে, সমরাভিযানের আয়োজন পরে করলেই হবে।

রাজা—তিনি আমার প্রাসাদের শয়নকক্ষে। যাই দেখি, বোধহয় তিনি প্রতীক্ষা করছেন।

রাজা দ্রুতপদে শয়নকক্ষে আসিয়া দেখিলেন যে, দিব্যপুরুষ চলিয়া গিয়াছেন।

রাজার তখন অনুতাপের অবধি থাকিল না, তিনি ক্রমাগত নিজের দুর্বুদ্ধির কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন—কেন তিনি ভাল করিয়া দিব্যপুরুষকে সব কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না, কেন রাজ্য-গুলির নাম জানিয়া লইলেন না। কেন তিনি দেবপুরুষের যথোচিত আদর অভ্যর্থনা করিলেন না। হায়—হায়! তিন তিনটা সমৃদ্ধ রাজ্য তাঁহার হাতছাড়া হইয়া গেল। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার আহারনিদ্রা প্রায় বন্ধ হইয়া গেল। ক্রমে পরিপাকশক্তি একেবারে নষ্ট হইয়া গেল। তাহাতে রক্তামাশয়ের পীড়া দেখা দিল, তাহার সঙ্গে অনিদ্রা ও শিরঃশূল।

দেশের সমস্ত চিকিৎসক চেষ্টা করিয়াও রাজাকে নিরাময় করিতে পারিল না। দূরদেশ হইতে বিখ্যাত বৈদ্যগণকে আহ্বান করিয়া আনা হইল, তাঁহারাও পীড়া অসাধ্য বলিয়া শেষ পর্যন্ত ঘোষণা করিলেন।

এই সময়ে বোধিসত্ত্ব তক্ষশিলা হইতে আয়ুর্বেদীয় বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া কাশীধামে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি রাজার জীবনকথা ও পীড়ার কথা শুনিয়া চিকিৎসা করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। রাজা কিন্তু একজন তরুণ চিকিৎসকের দ্বারা চিকিৎসিত হইতে চাহিলেন না। তিনি বলিলেন—"দেশের প্রবীণ বৈদ্যগণ যে রোগ সারাতে পারে নি, একজন অর্বাচীন বৈদ্য তা কি করে সারাবে?"

অমাত্যগণের পীড়াপীড়িতে রাজা স্বীকৃত হইলেন। বোধিসত্ত্ব চিকিৎসার জন্য আসিলে রাজা বলিলেন—"আমি অনেক ওষুধ

খেয়েছি। তুমি আর ওষুধ দিতে পাবে না। অন্য কোন উপায় থাকলে তার কথা বলো।”

বোধিসত্ত্ব রাজার কথার উত্তরে যাহা বলিলেন, তাহার মর্মার্থ এই বাসনাকে প্রশ্রয় দিলে কোনদিনই স্বস্তি লাভ হয় না, এক বাসনা যায়, আর এক বাসনাকে রাখিয়া। গ্রীষ্মকালে জল পান করিলে আবার যেমন তৃষ্ণার উদয় হয়, এক বাসনার নিবৃত্তি হইলে তেমনই আর এক বাসনার উদয় হয়—বাসনার নিবৃত্তির যে আনন্দ তাহা উপভোগ করিবার সময় পায় না ভোগ-লোলুপ মানুষ। কারণ, সঙ্গে সঙ্গেই নূতন বাসনার অস্বস্তি চিত্তকে আক্রমণ করে।

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে যেমন বাছুরের শিঙ বাহির হয়, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মানুষেরও তেমনি বাসনা জন্মে। এই বাসনাকে তরুণ বয়সেই দমন করিতে হয়; নতুবা তাহা বাড়িয়াই চলে, বার্ধক্যেও ইহার উপশান্তি হয় না।

যে ব্যক্তি আসমুদ্র পৃথিবীর সম্রাট, তাহারও ইচ্ছা হয়—সমুদ্রের পরপারে কোন রাজ্য থাকিলে তাহা জয় করিবার জন্য। কিন্তু একদিন সবই ফেলিয়া চলিয়া যাইতে হয়। একথা কোন তৃষ্ণাতুর রাজাই বুঝিতে চায় না।

সন্তুষ্টির মত সুখ আর কিছুতেই নাই। যে সুখের জন্য মানুষ বাসনার পরিতৃপ্তিসাধনে জীবনপাত করে, সে সুখ সে কখনও পায় না; মরীচিকার মত তাহা তাহাকে দূর হইতে দূরান্তরে লইয়া ভ্রান্ত শ্রান্ত ও আর্ত করিয়া তুলে। তুষ্টিতেই সে সুখ পাওয়া যায়। সন্তোষই অমৃত। অমৃত বলিয়া অন্য কিছুই স্বর্গে নাই—অমৃত মর্তেই আছে, তাহাই তুষ্টচিত্তে প্রাজ্ঞ

ব্যক্তিগণ আপন অন্তরেই লাভ করেন। সূর্যকিরণ যেমন সমুদ্রকে উত্তপ্ত করিতে পারে না, বাসনাও তেমনি প্রাজ্ঞ ব্যক্তিকে ব্যাকুল করে না।

চর্মকার যেমন পাদুকা নির্মাণের সময়ে চামড়ার অনাবশ্যক অংশগুলি ছাঁটিয়া বাদ দেয়, মহারাজ, আপনার লোভ লালসাকে সেইরূপ বর্জন করুন।

একটি তৃষ্ণার নিবৃত্তি হইলে ক্ষণিক সুখ জন্মে, সমস্ত তৃষ্ণা যদি দূর করিতে পারেন তাহা হইলে নিরবচ্ছিন্ন চিরসুখ বা সদানন্দ লাভ করিবেন।

মহারাজ, একটি রাজ্যরক্ষার জন্য আপনাকে কত ক্লেশ সহ্য করিতে হয়। তিনটি রাজ্য বাড়িলে আপনার ক্লেশ কত গুণ বাড়িবে চিন্তা করুন। জীবনে বিন্দুমাত্র স্বস্তি শান্তি আর থাকিবে না। যে রাজ্য তিনটির সন্ধান পান নাই—তাহাতে আপনার পরম-মঙ্গলই সাধিত হইয়াছে। আপনাকে চৈতন্য-দানের জন্য, আপনার কুতৃষ্ণার দণ্ডদানের জন্যই দেবপুরুষ নূতন রাজ্যের কথা বলিয়া অন্তর্হিত হইয়াছেন।

মহারাজ তুষ্ট হইয়া বলিলেন—"আমার আর কোন তৃষ্ণা নেই। আপনি কি পুরস্কার চান, বলুন।"

বোধিসত্ত্ব বলিলেন—"কিছুই চাই না, কোন বস্তুতে আমার তৃষ্ণা নেই। তৃষ্ণা নেই বলেই তৃষ্ণারোগের চিকিৎসা করি।"

মহারাজের চিত্ত বিগততৃষ্ণা ও প্রসন্ন হইল—ক্রমে সপ্তাহ-কালের মধ্যেই নিরাময় হইলেন। অবশিষ্ট জীবনে তিনি অনাসক্তভাবে রাজ্যপালন করিয়া মরণান্তে সদ্‌গতি লাভ করিলেন।

লোভের পরিণাম

সাধু সুলতান বাহলুলের রাজ্য ছিল ইরাক দেশে। তিনি ছিলেন একজন আদর্শ সুলতান। প্রজার মঙ্গলসাধন ছাড়া তাঁহার আর কোন চিন্তা বা ব্রত ছিল না। রাজকরের অতি সামান্যই তিনি পারিশ্রমিক হিসেবে গ্রহণ করিতেন। রাজপ্রাসাদে জাঁকজমক কিছু ছিল না। তিনি প্রত্যেক রাত্রিতে ছদ্মবেশে রাজ্যের নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। প্রজার অবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়া যে অঞ্চলে যে অভাব-অভিযোগ থাকিত, সেই অঞ্চলের লোকেরা রাত পোহাইবার অল্পক্ষণ পরেই দেখিত তাহা দূর হইয়া গিয়াছে ঠিক যেন মন্ত্রবলে। ছদ্মবেশে ঘুরিয়া ঘুরিয়া সুলতান জানিতে পারিলেন যে, দেশে এক তাঁহার ভাই ছাড়া আর কোন শত্রু নাই।

সুলতানের ভাই মামুন ছিলেন একটি প্রদেশের শাসনকর্তা। মামুনের লোভ ছিল সুলতানের মসনদে। তিনি ভাবিতেন, সুলতান বড় দুর্বল ও বুদ্ধিহীন। তিনি যদি রাজ্য পান তাহা হইলে রাজ্যের কত উন্নতি করিতে পারেন। তিনি রাজ্য পাইলে রাজকর বাড়াইয়া দিবেন। অনেক সৈন্যসামন্ত বাড়াইবেন, বিশাল প্রাসাদ তৈরী করিবেন, রাজধানীর জাঁকজমক হইবে বাগদাদের সুলতানেরই মত, আর ক্রমে ছোট ছোট প্রতিবেশী রাজ্যগুলি জয় করিয়া লইবেন।

'দাদা তো প্রজাদের চাকর, প্রজাদের হুকুমেই তিনি চলেন, একে কি রাজত্ব করা বলে?'

অনবরত এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে শেষ পর্যন্ত মামুন হইলেন বিদ্রোহী। সুলতান শুনিবামাত্র মামুনকে চিঠি লিখিয়া পাঠাইলেন—"ভাই, তুমি রাজ্য গ্রহণ কর। আমি অবসর নিতে চাই।"

মামুন ইহাকে খোদার দোয়া মনে করিয়া মহানন্দে আসিয়া রাজ্য দখল করিলেন। সুলতান বলিলেন, "ভাই তুমি রাজত্ব কর, আমি দেশভ্রমণে চললাম।"

সুলতান চলিয়া যাইলেন। তাঁহার বেগম ও পুত্রকন্যারা রাজপুরীতেই থাকিল। মামুন রাজ্য পাইয়াই বড় ভাইয়ের সব বিধি-নিয়ম আইন-কানুন বদলাইয়া দিলেন, রাজকর দিলেন তিনগুণ বাড়াইয়া, রাজপুরীর ঘটা-সমারোহ গেল বাড়িয়া, সৈন্য-সামন্ত ও শত শত উট ও ঘোড়ায় রাজধানী গমগম করিতে লাগিল। প্রজাশাসন চলিতে লাগিল দস্তুরমত। প্রজার আবেদন নিবেদনে তিনি কর্ণপাতও করিতেন না।

দেশে অন্নকষ্টে ও জলকষ্টে হাহাকার পড়িয়া গেল। প্রজাদের মধ্যে বিদ্রোহ দেখা দিল। মামুন জবরদস্তি বিদ্রোহ দমন করিতে লাগিলেন। ক্রমে বিদ্রোহ শান্ত হইল। কিন্তু গোপন ষড়যন্ত্র চলিতে লাগিল। চরেরা নিত্য নূতন চক্রান্তের সংবাদ আনিতে লাগিল। প্রাণের ভয়ে মামুন সকলকে অবিশ্বাস করিতে লাগিলেন। সর্বদা প্রহরীবেষ্টিত হইয়া থাকিতেন।

ক্রমে প্রহরীদের অবিশ্বাস করিতে লাগিলেন। নিজের মন্ত্রীকেও সকল কথা বিশ্বাস করিয়া বলিতে পারিতেন না। কাহাকেও কোন ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেন না। ক্রমে তাঁহার ধারণা হইল রাজপুরীতে কেহই তাঁহার বন্ধু নাই। সবাই

সুযোগ পাইলে তাঁহাকে হত্যা করিবে। সুলতানের স্ত্রী-পুত্রকেও রাজপুরীতে রাখিতে সাহস করিলেন না। তাঁহাদের পাঠাইয়া দিলেন অন্যত্র। যাহাকেই সন্দেহ হয় তাহাকেই বরখাস্ত করেন, নূতন নূতন লোক নিয়োগ করেন। শেষে বেগমদিগকেও অবিশ্বাস করিতে লাগিলেন। একে একে সব বেগমকেই নির্বাসিত করিলেন। খাদ্যদ্রব্য চাখনদারদের দ্বারা বারবার পরখ করাইয়া তবে খাইতেন। এক গ্লাস জল খাইতে গিয়াও তাঁহার হাত কাঁপিত। প্রত্যেক রাত্রে শয়নকক্ষ বদলাইতেন। দাসদাসী প্রহরীদের ঘুস দিয়া তুষ্ট রাখিতেন। ফলে সুলতান হইয়া তিনি নিজের নফর-গোলাম-বান্দাদেরই গোলাম হইয়া পড়িলেন। অসহ্য হইয়া উঠিল তাঁহার রাজতখত্। তিনি দেশে দেশে চর পাঠাইলেন বড় ভাইএর খোঁজে। বহুদিন সন্ধানের পর জানিতে পারিলেন, সুলতান বহুদূরে মদিনা-নগরীতে একটি আশ্রমে সাধন ভজন করিতেছেন। মামুন বহু লোক-লস্কর পাঠাইয়া দাদাকে চিঠিতে জানাইলেন—"দাদা, আমি বড় বিপন্ন। আপনার প্রজারা বিপন্ন, আপনি সত্বর এসে রক্ষা করুন।"

বাহলুল আর কি করিবেন! নিজের রাজ্যে ফিরিয়া আসিলেন। মামুন ছুটিয়া আসিয়া দাদার পায়ে পড়িলেন। তারপর কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "দাদা, আমার অপরাধ মাফ করুন। আপনার রাজ্য আপনি ফিরিয়ে নিন। এতো রাজত্ব নয়, এ জ্বলন্ত অঙ্গার! সর্বাঙ্গ পুড়ে খাক হয়ে গেল। রাজ্য-তৃষ্ণা আমার মিটেছে, আমি আপনার বান্দা হয়ে রইলাম।"

আসল সুলতানের আগমনে, রাজ্যময় আনন্দের সাড়া

পড়িয়া যাইল। সাধারণ প্রজাদের সঙ্গে কণ্ঠ মিলাইয়া মামুনও চীৎকার করিতে লাগিল—"জয় সুলতান বাহলুলের জয়।"

সুলতান বলিলেন—"গাছ তার পাকা পাতা ঝেড়ে ফেলে আর কি তা ফেরত নেয়? সাপ তার খোলস ছেড়ে ফেলে আবার কি গায়ে পরে? আমি যে রাজ্যের খোঁজ পেয়েছি, ভাই, তার কাছে এই রাজ্য তুচ্ছ! রাজত্ব তোমাকেই করতে হবে ভাই, তবে আমি যে উপদেশ দিয়ে যাচ্ছি সেইমত রাজ্য শাসন কর। আমি প্রজাদেরও তোমার অনুগত হয়ে চলতে আদেশ দিয়ে যাচ্ছি।"

কিন্তু মামুন তাহাতেও আর মসনদে বসিতে রাজী হইলেন না। এদিকে রাজ্যে একজন রাজা চাই—নহিলে অরাজকতায় রাজ্য ধ্বংস হইতে পারে। পাশের রাজারা সুযোগ পাইয়া রাজ্য অধিকার করিয়া লইবে।

বাহলুল তখন প্রজাদের মাতব্বরদের ও রাজ্যের আমীর ওমরাহদের সভা আহ্বান করিলেন। তিনি বলিলেন, "আমরা দু'জনেই মসনদ ত্যাগ করলাম, আপনারা নতুন সুলতান নির্বাচন করুন।"

প্রজাদের প্রতিনিধিরা বাহলুলের পায়ে ধরিয়া সাধাসাধি করিয়াও মতি ফিরাইতে পারিলেন না। তখন তাঁহারা নির্বাসন হইতে বাহলুলের পরিবার ও জ্যেষ্ঠ পুত্রকে ফিরাইয়া আনাইলেন। মামুনের বেগমদের ও পুত্রকন্যাদেরও আনাইলেন। তারপর প্রস্তাব করিলেন, 'সুলতান বাহলুলের পুত্রের সঙ্গে মামুনের কন্যার বিবাহ হোক এবং এরা দু'জনে রাজত্ব করতে থাকুক।'

ইহাতে সকলেই সম্মত হইলেন।

মহাসমারোহে তাহাদের বিবাহ হইল। বাহলুল আবার সাধন-ভজন করিবার জন্য মদিনায় চলিয়া যাইলেন। যাইবার সময়ে মামুন দাদার পায়ে ধরিয়া বলিলেন, "দাদা, আপনি যে রাজ্যের সন্ধান পেয়েছেন, এবার আমার সেই রাজ্যে লোভ হয়েছে। একা সেই রাজ্য ভোগ করতে পারবেন না। আমাকে সঙ্গে নিন।"

বাহলুল বলিলেন, "চল, জানি না তোমার চিত্তশুদ্ধি হয়েছে কিনা। এ রাজ্যের চেয়ে সে রাজ্য ভোগ করা আরও কঠিন, ভাই। চিত্তশুদ্ধি না হ'লে সে রাজ্যও হারাবে।"

মামুন বলিলেন, "দাদা যখন রক্ষক, তখন ভাইয়ের আর কোন ভয় নেই।"

চণ্ডালপুত্র

বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব একবার চণ্ডালরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি নগরের উপকণ্ঠে বাস করিতেন। একদিন তিনি পথের ধারে দাঁড়াইয়া ছিলেন, একজন শ্রেষ্ঠি-কন্যা শিবিকারোহণে উদ্যানে উৎসব করিতে চলিতেছিলেন। মাতঙ্গের বলিষ্ঠ ও সুগঠিত দেহ দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন —'এই লোকটি কে ?'

উত্তরে জানিতে পারিলেন যে, মাতঙ্গ একজন চণ্ডাল। শ্রেষ্ঠিকন্যা প্রভাতে চণ্ডাল দর্শন হইল মনে করিয়া উদ্যানে না গিয়া গৃহে ফিরিলেন এবং গন্ধোদক দ্বারা অপবিত্র চক্ষু ধুইয়া ফেলিলেন। সঙ্গের অনুচরগণ উৎসবভঙ্গ হইল বলিয়া বড়ই কুপিত হইল। কোপবশে তাহারা মাতঙ্গকে মারিয়া আধমরা করিয়া ফেলিয়া রাখিয়া গেল।

মাতঙ্গের এই দুর্দশা দেখিয়া নগরদেবতাদের ক্রোধের অবধি থাকিল না। তাঁহাদের কোপের ফলে শ্রেষ্ঠিকন্যার চক্ষু দুইটি অন্ধ হইয়া গেল এবং যাহারা প্রহার করিয়াছিল, তাহাদের উত্থানশক্তি রহিত হইয়া গেল। শ্রেষ্ঠিকন্যা বুঝিতে পারিল মাতঙ্গকে ঘৃণা করার জন্য তাহার এই দুর্দশা। তখন শ্রেষ্ঠিকন্যা মাতঙ্গের চরণে আসিয়া স্মরণ লইল।

মাতঙ্গ বলিলেন—"তুমি যদি আমার ভার্যা হও, তাহলে তোমার চক্ষু তুমি ফিরে পাবে এবং তোমার অনুচরগণ ও পারজনগণ আবার উঠে চলাফেরা করতে পারবে।"

শ্রেষ্ঠিকন্যা বাধ্য হইয়া মাতঙ্গকেই বিবাহ করিলেন। তিনি আবার চক্ষুর দৃষ্টি ফিরিয়া পাইলেন এবং অনুচরবর্গও সুস্থ হইল।

মাতঙ্গ ভাবিলেন যে, শ্রেষ্ঠিকন্যা বাধ্য হইয়া আমাকে বিবাহ করিয়াছে, অতএব তাহাকে সমস্ত নগরীর মধ্যে এমন সম্মানিত করিতে হইবে যেন তাহার কোন ক্ষোভ না থাকে; এই ভাবিয়া মাতঙ্গ প্রব্রজ্য গ্রহণ করিয়া কঠোর তপ করিতে লাগিলেন। তাঁহার কঠোর তপে শক্রের আসন উত্তপ্ত হইল। শক্রদেব মাতঙ্গের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া বলিলেন—"তুমি কি চাও বৎস?"

মাতঙ্গ বলিলেন—"প্রভু আমার ভার্যা এমন অলৌকিক শক্তি লাভ করুক যাতে সমস্ত নগরবাসীর সে উপাস্যা হতে পারে এবং তার গর্ভে একটি সর্বাঙ্গসুন্দর পুত্র হোক।"

মাতঙ্গ বর পাইয়া গৃহে ফিরিলেন, কিন্তু তিনি বেশিদিন গৃহে বাস করিলেন না। ভার্যাকে যথাযোগ্য উপদেশ দিয়া প্রব্রজ্যায় চলিয়া গেলেন। মাতঙ্গভার্যার অলৌকিক শক্তির কথা সমস্ত নগরে লোক ক্রমে জানিতে পারিল। একে তো তিনি মাতঙ্গের অলৌকিক শক্তির বলে হৃতচক্ষু লাভ করিয়াছিলেন, তারপর তিনি নিজে দুরারোগ্য রোগ সারাইতে পারিতেন। ফলে, চণ্ডালপত্নীর চরণতলে নগরের আপামর সাধারণ মস্তক অবনত করিল। তিনি প্রত্যহ রাশি রাশি এত অর্থলাভ করিতে লাগিলেন যে, অল্পদিনেই ধনেশ্বরী হইলেন।

কিছুকাল পরে তাঁহার একটি পুত্র হইল। বয়ঃক্রম আট বৎসর হইবামাত্র বারাণসীর প্রধান প্রধান আচার্যগণ তাহাকে বেদ ও অন্যান্য শাস্ত্র শিক্ষা দিতে লাগিলেন। ষোল বৎসর বয়সের মাতঙ্গপুত্র মাণ্ডব্য বেদজ্ঞ ও বহুবিদ্যায় বিশারদ হইয়া উঠিল।

ক্রমে তাহার মনে এমন অভিমান জাগিল যে, নিজে যে সে চণ্ডালের পুত্র তাহা পর্যন্ত ভুলিয়া গেল।

একদিন দৃষ্টমঙ্গলিকা (মাতঙ্গভার্যার নূতন নাম) ষোড়শ সহস্র শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ খাওয়াইতেছিলেন, মাণ্ডব্যকুমার নিজে স্বর্ণ পাদুকা পায়ে দিয়া তাঁহাদের মধ্যে বেড়াইতে বেড়াইতে 'এই পাতে মধু দাও—এই পাতে পায়েস দাও' ইত্যাদি আদেশ করিতেছিল। পুত্রকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য মাতঙ্গ পর্বমণ্ডপের এক কোণে ছিন্নবস্ত্র পরিধান করিয়া ধূলি মাখিয়া বসিয়া ছিলেন। যাহাতে মাণ্ডব্যের চোখে পড়েন সেজন্য মাঝে মাঝে কাসিতে লাগিলেন। চোখে পড়িতেই মাণ্ডব্য মাতঙ্গের নিকটে আসিয়া বলিল—"কে হে তুমি? পাংশু পিশাচের মত বসে আছ? এখানে ব্রাহ্মণ, অর্হৎ, ভিক্ষু ও শ্রমণদের ভোজন হচ্ছে, দেখতে পাচ্ছ না? এখান থেকে দূর হয়ে যাও?"

মাতঙ্গ—এত আহারের আয়োজন করেছেন, আমি একজন ক্ষুধার্ত ভিক্ষুক, আমি একমুঠো পাব না?

মাণ্ডব্য—হাঁ হাঁ। আয়োজন হয়েছে খুব। কিন্তু সে তোমার জন্য নয়। ধর্মনিষ্ঠ জ্ঞানীদের জন্য। এঁরা ভোজন করলে পুণ্য হবে, তোমার পেট ভরিয়ে লাভ কি হবে?

মাতঙ্গ—কৃষক যখন ধান্য বপন করে তখন উচ্চ, নীচু ও জলা জমি, তিন জমিতেই বীজ বপন করে। কিরূপ বৃষ্টি হবে তার ঠিকানা কি? অতিবৃষ্টি হলে উচ্চভূমির শস্য সে পায়, —অল্প বৃষ্টি হলে নীচু জমির শস্য সে পায়, একেবারে অনাবৃষ্টি হলে জলা জমির শস্য পায়। আপনারও সকল জাতির, সকল

শ্রেণীর লোককেই দান করা উচিত, কে জানে কাকে দান করলে কিরূপ পুণ্য হবে ?

মাণ্ডব্য—হাঁ, হাঁ, সুক্ষেত্র কাকে বলে তা আমি জানি। সেজন্যই ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তিদেরই ভোজন করাচ্ছি। যারা নীচ কুলে জন্মগ্রহণ করে, তারা পূর্বজন্মে মহাপাপী ছিল। মহা-পাপীদের আমি দান করি না।

মাতঙ্গ—যারা জাত্যহঙ্কারে অন্ধ, যাদের মন ক্রোধে, লোভে ও দ্বেষে পূর্ণ, তারা কখনও সুক্ষেত্র নয়।

মাণ্ডব্য—বেটা, আমার সঙ্গে রীতিমত তর্ক জুড়ে দিলি যে! বেটার ভারি স্পর্ধা দেখছি! তুই কে বল দেখি ?

মাতঙ্গ—আমি একজন চণ্ডাল।

মাণ্ডব্য—দূর, দূর। এই দারোয়ানেরা কোথায় ? একে মেরে আধমরা করে বিদায় করে দাও।

চণ্ডাল মণ্ডপে উঠিয়াছে শুনিয়া ব্রাহ্মণগণ আহার ত্যাগ করিয়া উঠিল। দারোয়ানেরা ছুটিয়া আসিল। দারোয়ানেরা মাতঙ্গের দেহ স্পর্শ করিবার আগেই মাতঙ্গ দিব্যরূপ ধারণ করিয়া আকাশে উঠিয়া বলিলেন—

জ্বলন্ত আগুন কেউ কি গিলতে পারে। নখ দিয়ে কি কেউ পর্বত বিদীর্ণ করতে পারে ? দাঁত দিয়ে চিবিয়ে কি লোহা খাওয়া যায় ? বেদ পাঠ করে তুমি মূর্খ হয়েছ! যে বিদ্যা দ্বেষ দম্ভ দূর করতে পারে না, তা অবিদ্যা।

মাণ্ডব্য অবাক হইয়া ঊর্ধ্ব দিকে চাহিয়া রহিল। নিমন্ত্রিতগণ বমন করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িল।

নগরদেবতারা মহাভিক্ষু মাতঙ্গের অপমানে কুপিত হইয়া

এক যক্ষকে প্রেরণ করিলেন। যক্ষ আসিয়া মাণ্ডব্যের মুণ্ড মোচড়াইয়া পিঠের দিকে ঘুরাইয়া দিল।

এই সংবাদ শুনিয়া দৃষ্টিমঙ্গলিকা ছুটিয়া আসিলেন। পুত্রের দুর্দশা দেখিলেন, নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের দুর্দশাও দেখিলেন। দারোয়ানদের কাছে আদ্যন্ত শুনিয়া তিনি বুঝিলেন মাতঙ্গ পণ্ডিতের অপমান হইয়াছে, সেজন্য নগরদেবতারা কুপিত হইয়া এই অনর্থ ঘটাইয়াছেন। তখন মাতঙ্গভার্যা মাতঙ্গের অনুসন্ধানে বাহির হইলেন। স্বামিদত্ত অলৌকিক শক্তিপ্রভাবে তিনি স্বামীকে খুঁজিয়া বাহির করিলেন এবং তাঁহার চরণে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

মাতঙ্গ বলিলেন—"এতো জাত্যভিমানের দণ্ড। মাণ্ডব্য যে চণ্ডালপুত্র তা সে জানে, তবু সে বেদ পাঠ করে ও ধনেশ্বর হয়ে ভাবছে যে, সে উচ্চজাতি। আর ঐ ভোজনলোভীর দল সকলেই জানে, মাণ্ডব্য চণ্ডালপুত্র, তবু সে ধনী বলে এবং প্রচুর দক্ষিণার লোভে তার অন্ন ভক্ষণ করছিল। চণ্ডাল বলে মাণ্ডব্য আমায় অপমান করল, আমি মণ্ডপে উঠেছিলাম বলে ভোজনলুব্ধের দল আহার ত্যাগ করল। এই কপটাচারের দণ্ড তাদের ভোগ করতেই হবে।"

দৃষ্টমঙ্গলিকা বলিলেন—"দুর্বুদ্ধির দণ্ড যথেষ্ট হয়েছে। মাণ্ডব্যের যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে। এখন রক্ষা করুন, প্রভু।"

মাতঙ্গ—এখন এক উপায় আছে। আমার উচ্ছিষ্ট অন্ন ঐ মৃৎপাত্রে পড়ে আছে। ঐ অন্নের এক মুষ্টি নিয়ে গিয়ে আমারই উচ্ছিষ্ট একথা জানিয়ে পুত্রকে খাওয়াও। তাতে পুত্র সুস্থ হবে।

দৃষ্টমঙ্গলিকা ঐ এক মুষ্টি অন্ন আনিয়া পুত্রকে বলিলেন—"মূর্খ, তোমার চণ্ডালপিতার এই উচ্ছিষ্ট অন্ন ভোজন করে সুস্থ হও।"

মাণ্ডব্য এখন বুঝিল যে, বিদ্যা ও ধনের অহংকারে অন্ধ হইয়া সে নিজের পিতারই অপমান করিয়াছে। তখন সে কাঁদিতে কাঁদিতে পরম আগ্রহে উচ্ছিষ্ট অন্ন মুখে দিল। মুখে এই অন্ন দিবামাত্র তাহার মুখ ঘুরিয়া গেল।

মাতা বলিলেন—"আর কোনদিন দুঃশীল লোভী লোকদের ভোজন করাবে না। ওরা চণ্ডালকে ঘৃণা করে চণ্ডালেরই অন্ন গ্রহণ করেছে, যতক্ষণ পর্যন্ত একটি অন্নও উদরে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত ওদের বমন করতে হবে। বিদ্যা ও অর্থলোভ করে যারা আপনার জাতিজন্মের কথা ভুলে যায়, আর যারা যাকে ঘৃণা করে অর্থ লোভে ও লালসার বশবর্তী হয়ে তারই অন্ন গোগ্রাসে গেলে, তাদের এরূপ দণ্ডই হয়।"

বেতালের কথা

রাজা বিক্রমাদিত্য প্রজাসাধারণের অবস্থা নিজ চোখে দেখিবার জন্য ছদ্মবেশে দেশভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন; বহু দিন পরে ফিরিলেন। গভীর রাত্রে নগরে ঢুকিতে যাইবেন, এমন সময় এক বীরপুরুষ আসিয়া বাধা দিয়া বলিল,—"আগে পরিচয় দাও, তারপর ঢুকতে দেব।"

রাজা বলিলেন—"আমিই রাজা বিক্রমাদিত্য।"

বীরপুরুষ বলিল "প্রমাণ কি? আমার সঙ্গে লড়াই কর। যদি হারাতে পার, তবে বুঝব তুমিই রাজা।"

রাজা বলিলেন—"তুমি কে?"

বীরপুরুষ—"বিক্রমাদিত্য দেশভ্রমণে চলে গেলে দেবরাজ তাঁর নগররক্ষার জন্য আমাকে পাঠিয়েছেন। আমাকে যুদ্ধে জয় না ক'রে তুমি নগরে ঢুকতে পারবে না।"

বিক্রমাদিত্যের সহিত বীরপুরুষের লড়াই বাধিল। বিক্রমাদিত্য জয়ী হইলেন এবং রক্ষীর বুকে চাপিয়া বসিলেন।

রক্ষী বলিল,—"আপনিই যে রাজা তা স্বীকার করছি। আমি তার পরিবর্তে আপনাকে প্রাণদান করছি ছেড়ে দিন।"

রাজা—পাগলটা বলে কি? আমি তোর বুকে ব'সে গলা টিপে ধরেছি, আর তুই আমাকে প্রাণদান করবি?

বীরপুরুষ বলিল—"ছেড়ে দিন, পরে বলছি, কেমন ক'রে প্রাণদান করছি। আমি একজন যক্ষ। আপনার জীবন সংশয় উপস্থিত হয়েছে। আপনাকে সতর্ক ক'রে প্রাণদান করছি।"

রাজা যক্ষকে ছাড়িয়া দিলেন। যক্ষ বলিল—"তবে শুনুন আপনি, ভোগবতী নগরীর রাজা চন্দ্রভানু ও এক যোগী এই নগরে একই নক্ষত্রে একই লগ্নে জন্মেছিলেন। চন্দ্রভানু তৈলিকগৃহে জন্মেছিলেন, নিজের ক্ষমতা বলে রাজা হয়েছিলেন। যোগী কুম্ভকারের গৃহে জন্মগ্রহণ ক'রে নিজের সাধনা বলে অলৌকিক ক্ষমতা পেয়েছেন। তিনি যোগবলে চন্দ্রভানুকে বধ ক'রে একটি শিরীষ গাছে তার মৃতদেহ টাঙিয়ে রেখেছেন। এখন আপনার প্রাণবধের চেষ্টায় আছেন এবং তাহ'লে তাল বেতাল সিদ্ধ হয়ে জগতের প্রভু হয়ে উঠবেন। আমি আপনাকে সাবধান করে দিয়ে প্রাণদান করলাম।"

এই বলিয়া যক্ষ চলিয়া গেলেন। রাজা বড়ই উদ্বিগ্ন হইলেন এবং সতর্ক হইয়াই থাকিলেন। একদিন শান্তশীল নামে এক ব্রাহ্মণ একটি বেল হাতে করিয়া রাজাকে আশীর্বাদ করিতে আসিলেন। রাজা বেলটি লইলেন এবং ভাবিতে লাগিলেন,—যক্ষ যে যোগীর কথা বলিয়াছিলেন, এই সেই ব্যক্তি নয়ত? মনে সন্দেহ হইল। বেলটা না খাইয়া না ভাঙ্গিয়া মন্ত্রীর হাতে রাখিতে দিলেন। সন্ন্যাসী প্রত্যেক দিন রাজাকে একটি করিয়া বেল দিয়া আশীর্বাদ করিয়া যাইতেন।

একদিন একটি বেল মন্ত্রীর হাত হইতে পড়িয়া গিয়া ভাঙ্গিয়া গেল—তখন তাহার মধ্য হইতে একটি মাণিক বাহির হইয়া পড়িল। তখন বাকি বেলগুলি ভাঙ্গিয়া দেখা গেল প্রত্যেকটির মধ্যে একটি করিয়া মাণিক। মাণিকগুলির দাম লক্ষ লক্ষ মুদ্রা। রাজা এই ব্যাপারে যত খুশী হইলেন, তত অবাক হইয়া গেলেন।

পরদিন সন্ন্যাসী আসিবামাত্র রাজা তাঁহার পায়ের তলায়

একেবারে ভক্তিতে লুটাইয়া পড়িলেন— সন্ন্যাসীকে সিংহাসনের অর্দ্ধাংশে বসাইলেন। রাজা সন্ন্যাসীর শিষ্য হইয়া বলিলেন, —"প্রভু, আপনার আমি আজ্ঞাবহ, যা বলবেন তাই করব।"

সন্ন্যাসী বলিলেন—"দেখ, আমি গোদাবরী নদীর তীরে এক শ্মশানে যোগ সাধনা করি—তুমি যদি আগামী ভাদ্র মাসের কৃষ্ণা চতুর্দশীর রাত্রে সেখানে একলা যাও, তাহলে তোমাকে আমার সাধনা কৌশল দেখাব। তুমিও আমার মত অলৌকিক শক্তি লাভ করতে পারবে। আমি যা বলব, তোমাকে কিন্তু তাই করতে হবে।"

রাজা অঙ্গীকার করিলে সন্ন্যাসী চলিয়া গেলেন। রাজা নির্দিষ্ট দিনে শ্মশানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে গিয়া যাহা দেখিলেন তাহাতে অন্য লোক হইলে ভয়েই মারা যাইত। কিন্তু বিক্রমাদিত্যের মত সাহসী সেকালে কেহ ছিল না, তাই তিনি একটুও ভয় পাইলেন না।

সেখানে রাজা দেখিলেন যে, ভূত প্রেত পিশাচের দল তাণ্ডবনৃত্য করিতেছে, আর সন্ন্যাসী দুইটি মড়ার মাথা লইয়া জোরে জোরে আঘাত করিয়া তাল দিতেছেন। রাজা প্রণাম করিয়া বসিলেন।

সন্ন্যাসী বলিলেন—"রাজন, তুমি তোমার কথা মত ঠিক দিনে এসেছ দেখে বড়ই খুশী হ'লাম। দুই ক্রোশ দক্ষিণে আর একটি শ্মশান আছে। সেই শ্মশানে একটি শিরীষ গাছে একটি শব ঝুলছে। সেই শবটা তুমি নিয়ে এস।"

রাজা তরবারি হাতে শব আনিতে গেলেন। শিরীষ গাছে উঠিয়া তরবারি দিয়া দড়ি কাটিলেন। শব অমনি নীচে

পড়িয়া খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। রাজা তো ব্যাপার দেখিয়া অবাক। রাজা ভয় পাইলেন না, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"কে তুমি মৃতদেহ আশ্রয় করে আছ?" কোন উত্তর নাই। রাজা শবটিকে কাঁধে তুলিয়া লইয়া চলিলেন। পথে শব কথা বলিতে আরম্ভ করিল—

"তোমাকে আমি কতকগুলো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করব—যদি তুমি ঠিক ঠিক উত্তর দাও, তবে আমি শিরীষ গাছে ফিরে যাব। আবার আমায় নিয়ে আসতে হ'বে। আর যদি জেনেও ঠিক-ঠিক উত্তর না দাও তবে আপনা হ'তেই তোমার বুক ফেটে যাবে।"

তারপর শবটি পঁচিশটা গল্প বলিয়া প্রত্যেক গল্পের শেষে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিল। রাজা সবগুলির ঠিক ঠিক জবাব দিলেন। রাজাকেও পঁচিশবার শিরীষ গাছে ফিরিয়া আসিতে হইল।

শেষে শব খুশী হইয়া রাজাকে বলিল—"দেখ আমি তোমার সাহস, সহিষ্ণুতা, একাগ্রতা ও অধ্যবসায় দেখে বড়ই খুশী হ'য়েছি। এইবার আমার পরিচয় শোন। যে শবটা তুমি নিয়ে যাচ্ছ তাহা রাজা চন্দ্রভানুর মৃতদেহ। আমি একে আশ্রয় করেছি। ঐ যোগীর নাম শান্তশীল, ও কুমোরের ছেলে। কঠোর সাধনা ক'রে অলৌকিক শক্তি পেয়েছে এবং ঐ শক্তির বলে রাজা চন্দ্রভানুকে বধ ক'রেছে। এখন তোমাকে বধ করতে পারলেই ওর পরম ইষ্টসিদ্ধি হয়। ও কি করবে জান? ও মহাকালীর পূজা করে তোমাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করতে বলবে। তুমি যেমনি প্রণাম করবে—অমনি খড়্গের আঘাতে তোমাকে বধ করবে। তারপর তোমার ও চন্দ্রভানুর মৃতদেহ

তেলের কড়াইয়ে চাপিয়ে দেবে, ফলে তাল বেতাল সিদ্ধ হয়ে জগতের প্রভু হবে। তুমি কিছুতেই প্রণাম ক'রো না। তুমি বলবে,—আমি রাজার ছেলে, সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করতে জানি না। আপনি প্রণাম ক'রে দেখান। যোগী যেমনি প্রণাম ক'রে তোমাকে দেখাতে যাবে, অমনি খাঁড়ার আঘাতে·····বুঝেছ কিনা। তারপর দুটা মড়াই কড়াইয়ে দেবে চাপিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে দেখবে ওর সাধনার ফল তুমিই লাভ করেছ।"

রাজা বলিলেন—"তিনি যোগী, গুরু, তাঁকে কি ক'রে বধ করব? আমি শবটা ফেলে দিয়ে চ'লে যাব।"

বেতাল বলিল—"চ'লে গেলেই কি রেহাই পাবে ভাবছ? যেমন ক'রে পারে ও তোমাকে বধ করবেই। শেষে যোগবলে অভিচার ক'রেও চন্দ্রভানুর মত তোমাকে বধ করবে। যা বলছি তাই কর। কিসের গুরু সে? তোমাকে বধ করবার জন্য মাণিক উপহার দিয়ে ভুলিয়ে এখানে এনেছে। তুমিও যেমন বোকা, তাই ওর কথায় বিশ্বাস করেছ। ওকে বধ করাই তোমার রাজধর্ম। তা ছাড়া তুমি নিজে বেঁচে যাবে ও জগতের প্রভু হবে।"

যক্ষের কথা রাজার মনে পড়িল। রাজা শবটি লইয়া যোগীর কাছে আসিলেন। বেতাল ইত্যবসরে শবটি ছাড়িয়া চলিয়া গেল। যোগী শবটিকে বাঁচাইয়া মহাকালীর সম্মুখে বলি দিল এবং রাজাকে প্রণাম করিতে আদেশ করিল।

রাজা বলিলেন,—"আমি রাজার ছেলে, জীবনে কখনও কাউকে প্রণাম করিনি। প্রণাম কাকে বলে জানিও না। আপনি দেখিয়ে দিন কেমন ক'রে প্রণাম করতে হয়।"

যোগী যেমন প্রণাম দেখাইতে গেল—অমনি রাজা খড়্গাঘাতে যোগীর মাথাটি কাটিয়া ফেলিলেন। একটি চুল্লীতে তেলের কড়াই চাপানো ছিল, তাহাতে তিনি দুইটা মড়াই ফেলিয়া দিলেন। বড় বড় থামের মত ধোঁয়া উঠিতে লাগিল, তাহা হইতে দুই বিকটাকার পুরুষের আবির্ভাব হইল। তাহারা রাজাকে প্রণাম করিয়া বলিল "মহারাজ, আজ্ঞা করুন ?"

রাজা বলিলেন,—"স্মরণ করলেই এসে হাজির হবে এবং যা করতে বলব তাই করবে, এখন যাও।"

এইভাবে বিক্রমাদিত্য তাল-বেতাল সিদ্ধ হইলেন।

বিক্রমাদিত্য অসাধারণ বীর ছিলেন বলিয়াই এইরূপ গল্প রচিত হইয়াছে। এদেশে কেহ কোন অদ্ভুত ও বিচিত্র শক্তির পরিচয় দিলেই তাহার শক্তিকে দৈবী বা অলৌকিকী বলিয়া মনে করা হইত এবং তাহা লইয়া এক শ্রেণীর গল্প রচিত হইত।

তীর্থদর্শন

সে অনেক দিনের কথা। নদীয়া জেলার এক গ্রামে দুই বন্ধু বাস করিত। একজনের নাম কমলাকান্ত চক্রবর্তী, আর একজনের নাম কেনারাম ঘোষ। একজন জাতিতে ব্রাহ্মণ, আর একজন সদ্‌গোপ। জাত্যংশে ও আর্থিক অবস্থায় অনেক তফাৎ হইলেও দুইজনের মধ্যে বন্ধুত্ব ছিল। কমলাকান্ত বিষয়ী লোক, তাহার অনেক জমিজায়গা ছিল, যজমান-শিষ্যও ছিল, পাকা বাড়ী ছিল, তাহার উপর দোতলা উঠিতেছিল।

কেনারামের নিজের চাষবাস ছিল। নিজের জমি অল্প, পরের জমি সে চাষ করিত। বৃদ্ধ বয়সে নিজে আর লাঙ্গল ধরিত না; লোকজন রাখিয়া চাষ করিত। দুইজনেরই বহুদিন হইতেই ইচ্ছা, পুরী গিয়া জগন্নাথদেবের চাঁদমুখখানি দেখিয়া আসে।

তখন রেলগাড়ী হয় নাই, পথ হাঁটিয়াই যাইতে হইবে, খরচপত্রও যথেষ্ট। কেনারাম যখনই বলিত—'দাদাঠাকুর চল, এবার যাই।' কমলাকান্ত বলিত—'এ বৎসর বড় খরচের টানাটানি, আসছে বছর নিশ্চয়ই যাব।' এমনি করিয়া কয়েক বৎসর অতীত হইল। দাদাঠাকুরের আর সময় হয় না।

সে বৎসর কেনারাম অত্যন্ত পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল—"দাদাঠাকুর, বয়সও ষাট বৎসর হ'ল। শরীরের বল ক্রমেই ক'মে আসছে। আর দেরী না। চল এবছর যাই।"

চক্রবর্তী বলিল—"এ বছর কি করে হয়, কেনারাম?

এবার বাড়ীতে দোতলা তুলছি, ছোট ছেলের বিয়ের কথা হ'চ্ছে, একটা মোকর্দ্দমা চলছে, আবার অনেকগুলি শিষ্যের বাড়ীতে বিয়ে আছে। এ বছর আর হয়না ভাই।"

কেনারাম—সাত আট বছর ধরে ঠিক একই কথা বলছ। তার চেয়ে বলনা কেন, যাব না? মিছে আশা দিয়ে রেখেছ। একজন ব্রাহ্মণের সেবা করতে করতে যাব, সহজে ভগবানের দয়া পাব, তাই তোমার ভরসায় বসে আছি।

চক্রবর্তী—তাতো বটে, কেনারাম, টাকাকড়ির তো যোগাড় চাই। অনেকগুলি টাকা যে।

কেনারাম—আমি গরীব মানুষ। কোন রকমে ধারধোর ক'রে টাকা যোগাড় করলাম। আর তোমার অত আয়, ছেলেপুলে উপযুক্ত, তুমি আর দু'একশ টাকা যোগাড় করতে পারবে না? বল কি? অবাক করলে যে!

চক্রবর্তী—এই বাড়ীটা দোতলা করতেই একেবারে সর্বস্বান্ত হয়ে পড়লাম কিনা। দেখি যদি সবগুলোর ব্যবস্থা করতে পারি, তবে যাব। সব ইচ্ছা মায়ের ইচ্ছা রে, কেনারাম। ওকি আমাদের ইচ্ছাতেই হবে?

যাহাই হউক কমলাকান্ত সেবার পুরী যাওয়া স্থিরই করিল। ক্রমে বৈশাখ মাস অতীত হয়, কমলাকান্তের সাংসারিক বিলিব্যবস্থা আর হইয়া উঠে না। একটা-না-একটা ঝঞ্ঝাট লাগিয়াই আছে। ছেলেদের ডাকিয়া সকল কাজের ভার দিয়া অর্থাৎ কিসে কত খরচ হইবে, কোথায় কি পাওনা আছে,—কোথায় কোন যজমানের বাড়ীতে কি প্রাপ্তির আশা আছে, মোকর্দ্দমার তদ্বিরই বা কিরূপ করিতে হইবে

ইত্যাদি ছেলেদের সমস্ত বুঝাইয়া, বার বার উপদেশ দিয়া, নানা বিষয়ে সতর্ক হইতে বলিয়া জ্যৈষ্ঠের প্রথমেই চক্রবর্তী মহাশয় কেনারামের সঙ্গে শুভদিনে পুরী যাত্রা করিল।

যাত্রার সময়ে ছেলেদের আবার সমস্ত বিষয়ে সতর্ক করিয়া দিল। কেনারাম এক ডাকেই বাহির হইয়া আসিল, সঙ্গে একটি ক্যাম্বিসের ব্যাগ। সংসার সম্বন্ধে সে কাহাকেও কোন উপদেশই দিল না। শুধু বলিয়া গেল—'বেঁচে থাকিতো আবার দেখা হ'বে।'

দুইজনে পথ চলিতে লাগিল। কমলাকান্তের আর উদ্বেগের সীমা নাই। বাড়ীতে ছেলেরা কি অপব্যয়ই না করিতেছে, কতজন কত রকমেই না তাহাদের ঠকাইতেছে, ফিরিয়া আসিয়া হয়ত দেখিব, সর্বনাশ করিয়া বসিয়া আছে। এদিকে বাড়ী ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কেনারামের মন হইতে সংসারের সকল চিন্তা দূর হইয়া গেল। সে গলা ছাড়িয়া পথে গান করিতে করিতে চলিয়াছে। মনে কিছুমাত্র উদ্বেগ নাই।

মেদিনীপুর জেলা পার হইয়া ক্রমে তাহারা উড়িষ্যায় প্রবেশ করিল। গ্রীষ্মকাল। দিনের বেলায় বেশি পথ চলিতে পারে না, রাত্রিতে পথ চলে। দিনের বেলায় বিশ্রাম করে। বালেশ্বর জেলার একটি গ্রামের পাশ দিয়া যাইবার সময় কেনারামের বড় পিপাসা পাইল। সে বলিল—"দাদাঠাকুর, তুমি একটু এগিয়ে চল, নয়ত গাছতলায় বস, আমি ছুটে গিয়ে এই গ্রাম থেকে জল খেয়ে আসছি।"

এই বলিয়া কেনারাম গ্রামে ঢুকিয়া একটি বাড়ীর দুয়ারে দাঁড়াইয়া জল চাহিল। কেহ উত্তর দিল না দেখিয়া সটান

বাড়ীর মধ্যেই প্রবেশ করিল। সেখানে যে দৃশ্য দেখিল, তাহাতে স্তম্ভিত হইয়া গেল।

দুইটি কঙ্কালসার স্ত্রীলোক মাটিতে পড়িয়া ছট্‌ফট্‌ করিতেছে, একটি ছোট মেয়ে ক্ষুধার জ্বালায় কাঁদিতেছে। একটি পুরুষ লাঠিতে ভর দিয়া আগাইয়া আসিল। সকলেরই মৃত্যু আসন্ন।

খবর লইয়া কেনারাম জানিল যে গ্রামে ভীষণ দুর্ভিক্ষ চলিতেছে। ইহাদের সর্বস্ব গিয়াছে। কয়েকদিন হইতে ইহারা কিছুই খাইতে পায় নাই। গ্রামে বহুলোক না খাইয়া মরিয়া গিয়াছে। অনেকে গ্রাম ত্যাগ করিয়া অন্য গ্রামে চলিয়া গিয়াছে। দুইচার ঘর মাত্র লোক এখনও আছে।

নিজের সঙ্গে সামান্য যে খাদ্য ছিল কেনারাম তাহা তাহাদিগকে দিল। যে কয়েকটি টাকা সঙ্গে ছিল তাহাতে কয়েক মণ চাউল কিনিয়া আনিল। মাস দেড়েক সেখানে থাকিয়া বাকী টাকাতে আগামী বৎসরের জন্য চাষের সাজ-সরঞ্জাম কিনিয়া কিছু কিছু জমি চাষ করিয়া দিয়া আস্তে আস্তে বাড়ী ফিরিল। সঙ্গে এক পয়সাও থাকিল না। তীর্থে যাওয়া দূরে থাকুক, পথে ভিক্ষা করিতে করিতে ফিরিতে হইল।

কমলাকান্ত কেনারামকে দুইদিন ধরিয়া অনেক খোঁজাখুঁজি করিল; কিন্তু কোথাও তাহার সন্ধান না পাইয়া একাই পুরীর দিকে চলিল। যথাসময়ে পুরীতে পৌঁছিয়া মন্দিরে পূজা দিতে গেল। কেনারামের জন্য বড় দুঃখ হইতে লাগিল।

কমলাকান্ত মন্দিরের ভিড়ের মধ্যে দেখিল যে, কেনারাম জোড়হাতে দাঁড়াইয়া আছে। তাড়াতাড়ি কেনারামকে দেখিয়া

'কখন এলে?' বলিয়া আগাইয়া গেল, কিন্তু কিছুতেই কেনারামকে ধরিতে পারিল না।

কমলাকান্ত প্রত্যহ আরতির সময়ে মন্দিরে যাইত, ভিড়ের মধ্যে কেনারামকে দেখিত, কিন্তু কিছুতেই কেনারামকে ধরিতে পারিত না। গুণ্ডিচাবাড়ী, সিদ্ধ বকুল, চক্রতীর্থ, লোকনাথের মন্দির যেখানেই যাইত, কেনারামকে দেখিতে পাইত, কিন্তু কিছুতেই ধরিতে পারিত না। চীৎকার করিয়া ডাকিয়াও সাড়া পাইত না। যেখানে যত যাত্রীর আস্তানা বা ধর্মশালা আছে, সব জায়গায় খুঁজিল কোথাও কেনারামের সন্ধান পাইল না। রথের দিন দেখিল, কেনারাম দড়া ধরিয়া গুণ্ডিচা-বাড়ী পর্যন্ত বরাবর রথ টানিতে টানিতে চলিয়াছে। ভিড় ঠেলিয়া তাহার কাছে যাইতে পারিল না। তখন ভাবিতে লাগিল ব্যাপার কি? তবে কি কেনারাম মরিয়াছে, তাহার প্রেতাত্মা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে? তাহার পুরী আসিবার বড় সাধ ছিল, পথেই মরিয়া গেল বলিয়া প্রেতদেহে সে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতেছে। চক্রবর্তীর কেমন ভয়-ভয় করিতে লাগিল।

তীর্থ সারিয়া চক্রবর্তী পথে ভুবনেশ্বর-মন্দিরে পূজা দিতে গেল। সেখানেও দেখিল, কেনারাম একদৃষ্টিতে জোড়হাতে দেবতার পানে চাহিয়া আছে। চক্রবর্তী ছুটিয়া গেল; কাছে গিয়া দেখিল, কেনারাম নয়, অন্য লোক। চক্রবর্তী ভাবিতে লাগিল—'একি দৃষ্টিরই ভুল?'

যথাসময়ে চক্রবর্তী বাড়ী ফিরিল। আসিয়াই কেনারামের কথা জিজ্ঞাসা করিল। ছেলেরা বলিল—'সে তো পথ থেকেই ফিরে এসেছে।'

কমলাকান্ত অন্তঃপুরে প্রবেশের আগেই কেনারামকে ডাকাইয়া আনিল, জিজ্ঞাসা করিল—'কেনারাম, ব্যাপার কি ?' কেনারাম বলিল,—"সে আর বোলো না দা'ঠাকুর। জল খেতে গিয়ে পড়লাম ডাকাতের হাতে। সব কেড়ে নিয়ে মেরে ধ'রে তারা আমাকে নদী গর্ভে ফেলে রেখে চলে গেল। পাঁচ ছয় ঘণ্টা পরে জ্ঞান হ'ল। তখন বহু কষ্টে একটা গ্রামে আসলাম। সেখানে দিন সাত থেকে শরীরটাকে একটু মেরামত ক'রে 'জয় জগন্নাথ' বলে সটান বাড়ী চ'লে এলাম, হরিনাম ক'রে পথে ভিক্ষে করতে করতে। আমার কীর্তন গাওয়ার শখটা এবার ভারি কাজে লেগে গেছে, দা'ঠাকুর।"

কমলাকান্ত পুরীতে কেনারামকে যে বারবার দেখিয়াছিল, সে কথাটা চাপিয়া গেল। বুঝিল যে, ভগবান ভক্তিরই বশ। ভক্তি থাকিলে কোন তীর্থেই যাওয়ার প্রয়োজন হয় না।

কবির ভাগ্য

ফরাসী ভাষায় শাহ্‌নামা নামে একখানি মহাকাব্য আছে। এই মহাকাব্যে পারস্যদেশের বড় বড় বাদশাহের কীর্তির কথা লেখা আছে। এই মহাকাব্যের কবির নাম মহম্মদ আবুল কাসেম, ফেরদৌসি তাঁর দরবারী নাম। এই নামেই তিনি দুনিয়ায় পরিচিত। পারস্যদেশের তুস নগরে কবির জন্ম। কবির পিতা ছিলেন একটা সরকারী বাগানের তদারককারী। কবির বাল্যজীবন বেশ সুখেই কাটিয়াছিল। কিন্তু সুখের দিন শীঘ্রই ফুরিয়া গেল। তুসের শাসনকর্তা কবির বাবাকে বিষ-নজরে দেখিতে লাগিল। ফল হইল নিদারুণ দারিদ্র্য। কাসেম তখন রোজগারের জন্য বাড়ী ছাড়িতে বাধ্য হইলেন। ঘুরিতে ঘুরিতে কবি আসিলেন গজনি নগরে।

গজনির সুলতান তখন মাহ্‌মুদ। এই মাহমুদ ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া বহু ধন লুঠতরাজ করিয়া লইয়া যান। কিন্তু তিনি কবি, গুণী ও জ্ঞানীদের সম্মান করিতেন এবং নিজের দরবারে আদরে ডাকিয়া তাঁহাদের প্রতিপালন করিতেন।

কাসেম বাল্যকাল হইতেই কবিতা লিখিতেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল মাহ্‌মুদ একবার তাঁহার কবিত্বের পরিচয় পাইলে তাঁহার দরবারে ঠাঁই হইবে। এই ভরসায় তিনি গজনি নগরে আসিলেন। এ-নগরে তাঁহার পরিচিত কেহ ছিল না। একটা সরাইখানায় আশ্রয় লইয়া তিনি গজনি নগরের পথে পথে ঘুরিতে লাগিলেন। রুক্ষ কেশ, শীর্ণ দেহ, মলিন বেশ দেখিয়া

তাঁহাকে ভিক্ষুক, পথের ভিখারী বলিয়াই মনে হইত। তাঁহার পক্ষে শাহী দরবারে পরিচিত হওয়ার কোন সম্ভাবনাই তখন পর্যন্ত ছিল না।

একদিন সন্ধ্যাকালে কবি এক বাগানে প্রবেশ করিয়া গাছতলায় বসিয়া বিশ্রাম করিতেছেন।

এই বাগানে সে সময়ে শাহী দরবারের তিনজন কবি আসিয়া কাব্যালোচনা শুরু করিলেন। হঠাৎ তাঁহাদের চোখে পড়িল যে, একজন মলিনবেশে যুবক নিকটেই বসিয়া আছেন। কবিরা তাঁহাকে তাড়াইবার চেষ্টা করিলেন কৌশলে। কিন্তু কাসেম নড়িলেন না।

তখন তাঁহারা বলিলেন—"দেখ, আমরা কবি। আমরা কাব্যালোচনা করছি, কবি ছাড়া আর কেউ এখানে থাকে আমরা পছন্দ করি না।"

কাসেম উত্তর করিলেন—"আমিও একজন কবি।"

কবিরা বলিলেন—"তুমি কবি! আচ্ছা আমরা তিনজনে তিন চরণ কবিতা বলব, তুমি চতুর্থ চরণ পূরণ কর দেখি?"

কাসেম সঙ্গে সঙ্গেই পূরণ করিয়া দিলেন। কবিরা তাহাতে সত্যই তুষ্ট হইলেন। কাসেম আর্জি জানাইলেন—"আমাকে সুলতানের দরবারে পরিচিত করে দিন।"

তাঁহাদের মধ্যে যিনি প্রধান, তাঁহার নাম ছিল আনসারী। আনসারী দেখিলেন যে, এই তরুণ কবিকে দরবারে লইয়া গেলে তাঁহার কদর আর থাকিবে না। আনসারী কাসেমের আর্জি মঞ্জুর করিলেন না।

কাসেম আবার পথে পথে ঘুরিতে লাগিলেন। উজীর

মোহেক তাঁহাকে মাহ্‌মুদের দরবারে লইয়া গেলেন। কাসেম একটা কবিতা লিখিয়া সুলতানের গুণগান করিলেন। সেই কবিতা শুনিয়া সুলতান এতই খুশী হইলেন যে, উত্তেজিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন—আয় ফেরদৌসি তু দরবারে মা রা ভেরদৌস করদী—(ফেরদৌসি, তুমি আমার দরবারকে স্বর্গ ক'রে তুললে)। সেই থেকে কাসেমের নাম হ'ল ফেরদৌসি।

এরপর কাসেম শাহী দরবারের প্রধান কবি হইলেন।

সুলতান কাসেমকে পারস্যের রাজবংশের ইতিহাস কাব্যে লিখিবার আদেশ দিলেন। কাসেমও খুব মনোযোগের সঙ্গে তাই লিখিতে লাগিলেন। কথা থাকিল প্রত্যেক শ্লোকের জন্য কবি এক একটি সোনার মোহর পাইবেন। এই কাব্যই শাহ্‌নামা।

ত্রিশ বৎসর পরিশ্রম করিয়া কাসেম ষাট হাজার শ্লোকে শাহ্‌নামা শেষ করিলেন। সুলতানকে কাব্য উপহার দিলে সুলতান খুব খুশী হইলেন। সুলতান কবি আনসারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কবি, তোমার এ-কাব্য কেমন লাগল ?"

আনসারী জবাব দিলেন, "খোদাবন্দ, কাব্য মন্দ হয় নি তবে যে রকম ভালো হবে আমরা আশা করেছিলাম, তেমনটি হয়নি। এর পুরস্কার ষাট হাজার সোনার মোহর নয়, ষাট হাজার রূপার টাকা।"

সুলতান উজীর ময়মন্দিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"উজীর সাহেব, আপনার অভিমত কি ?"

ময়মন্দি বলিলেন—"দেখুন জাহাঁপনা, কাব্য ভালো-মন্দ আমি বুঝি না। আমি দেখছি এ-কাব্য আপনাকে অপমানিত

করবার জন্যই লেখা। কারণ এতে উচ্চকুল ও বংশমর্যাদারই গুণগান করা হয়েছে। যে সুলতান সামান্য কুলে জন্মে নিজের বাহুবলে ও প্রতিভাবলে শাহান্‌শা হয়েছেন—তাঁকে এতে অনাদরই করা হয়েছে। আমার মতে এর জন্য পুরস্কার কিছুই দেওয়া উচিত নয়। তবে লোকটা ত্রিশ বছর ধ'রে আপনার আশ্রয়ে পড়ে আছে। ওকে একেবারে বঞ্চিত করা উচিত নয়। আনসারী যা দিতে বললেন তাই দিয়েই একে বিদায় করা উচিত।"

মাহ্‌মুদ নিজে রাজবংশে জন্মাননি, অতি নীচকুলে জন্মিয়াছিলেন। উজীরের কথা তাঁহার মনে লাগিল। তিনি ষাট হাজার রূপার টাকাই কাসেমের কাছে পাঠাইলেন। কাসেম রাগে ক্ষোভে ঘৃণায় মুহ্যমান হইয়া পড়িলেন। তিনি ষাট হাজার টাকা সুলতানের চাকর-বাকরদের মধ্যে বিলাইয়া দিলেন। সুলতান যখন একথা শুনিলেন, তখন তিনি রাগে একেবারে জ্ঞানহারা হইয়া কাসেমকে হাতীর পায়ের তলায় ফেলিয়া হত্যা করিতে হুকুম দিলেন।

কাসেম তখন সুলতানের দরবারে আসিয়া দয়া ভিক্ষা করিয়া প্রাণ বাঁচাইলেন। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলেন, এ রাজ্যে আর একদিনও থাকা উচিত নয়। তিনি সুলতানের রাজ্য ছাড়িয়া অন্য রাজ্যে গিয়া এক কবিতা লিখিয়া সুলতানের কাছে পাঠাইয়া দিলেন।

সে কবিতা এই—

যদি রাজকুল গৌরবে হ'ত জনম তব,
করিতে না তবে আমার এমন অগৌরবও।

শোণিতে যাহার নাই এক কণা উচ্চ মান,
মানীর আদর কেমনে সহিবে সে সুলতান ?
নিমের মতন যে তরুর বীজ বিষম তিত,
নন্দনবনে হোক না সে তরু সুবর্ষিত,
জমজম-ধারা সে তরুর মূলে যতই ঢালো,
দুগ্ধের সাথে মধু দিয়ে তারে যতই পালো,
তিত ফল-ফুল সে তরু প্রসব করিবে তবু,
হীন অভাজন আপন প্রকৃতি ছাড়ে না কভু ॥

এই কবিতা পাঠ করিয়া সুলতান রাগে আত্মহারা হইলেন। তখনই হুকুম দিলেন—"কবিকে যেখানে পাও হাতে পায়ে শিকল বেঁধে ধ'রে আন।"

কবি তখন বাগ্‌দাদের খলিফার দরবারে। সুলতান যখন একথা শুনিলেন, তখন তিনি খলিফার দরবারে দূত পাঠাইলেন, "এখনি কাসেমকে গজনিতে পাঠিয়ে দেওয়া হোক ?"

এই বার্তা দূত খলিফাকে জানাইলেন। খলিফা দূতের কথা গ্রাহ্যই করিলেন না। তিনি বলিয়া পাঠাইলেন—"আমি গজনির সুলতানের তাঁবেদার নই, আমি এ হুকুম মানতে বাধ্য নই।"

মাহমুদ যদি খলিফার রাজ্য আক্রমণ করিতেন, তাহা হইলে খলিফা ঠেকাইতে পারিতেন না। কবি বাগদাদে থাকাও নিরাপদ মনে করিলেন না, সেখান হইতে চলিয়া গিয়া সিরাজনগরে শেষজীবন কাটাইতে লাগিলেন।

এদিকে সুলতান মাহমুদের রাগও ক্রমে পড়িয়া আসিয়াছিল, তাঁহার মনে অনুতাপ হইতেছিল। চারিদিকে অজস্র ধন-সম্পদের

পানে চাহিতে চাহিতে তাঁহার মনে হইতে লাগিল—, "আমার তো দিন ফুরিয়ে আসছে, আমি অতি বৃদ্ধ হয়েছি, এ সব ধনরত্ন সঙ্গে যাবে না। কবিকে বঞ্চিত করে আমার লাভটা কি হল ?"

কুর্দিস্তানের সুলতান কবি কাসেমকে খুব ভালবাসিতেন। তিনি সুলতান মাহ্‌মুদকে এক পত্র দিলেন।

তিনি লিখিলেন যে, আপনার ভয়ে পারস্যদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি চোরের মত লুকাইয়া লুকাইয়া দেশে দেশে ঘুরিতেছেন, ইহাতে আপনার পবিত্র নাম কলঙ্কিত হইয়াছে। তাঁহার প্রাপ্য অর্থ যদি আজও তাঁহাকে দিয়া আপনার জবান ঠিক না রাখেন—তাহা হইলে জগতের ইতিহাসে আপনার নাম চিরকলঙ্কিত হইয়া থাকিবে। আপনি যদি তাঁহার প্রাপ্য অর্থ পাঠাইয়া দেন, তবে আমি তাঁহার কাছে পৌঁছাইয়া দেব।

এই পত্র পাইয়া সুলতান মাহ্‌মুদ ষাট হাজার মোহর পাঠাইয়া দিয়া কবির কাছে ক্ষমা চাহিলেন। এই মোহরগুলো সিরাজনগরে কবির গৃহে যখন পৌঁছিল, তাঁহার মৃতদেহ গোরস্তানে লইয়া যাওয়া হইতেছে। কবির তেজস্বিনী কন্যা সুলতানের প্রেরিত মোহরগুলো ফিরাইয়া দিলেন।

সারাজীবন তিনি দুঃখ কষ্ট পাইলেও, বহু নির্যাতন সহ্য করিলেও তাঁহার জীবনসাধনা কিন্তু ব্যর্থ হয় নাই। তিনি যে মহাকাব্য দুনিয়াতে রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তিনি অমর হইয়া আছেন। বিশ্বের কাব্যরসিকদের মনের মুলুকে তিনি সুলতান মাহ্‌মুদের অপেক্ষা ঢের ঢের বড় শাহানশাহ্‌ সুলতান হইয়া চিরকাল বিরাজ করিতেছেন।

দেশরক্ষা

বহুপূর্বে ইতালী অনেকগুলি রাজ্যে বিভক্ত ছিল। এই রাজ্যগুলি পরস্পর কেবল কাটাকাটি করিত। রোম তখন ক্ষুদ্র রাজ্য মাত্র ছিল। এই রাজ্যের রাজা ছিল টার্কিন—প্রচণ্ড দাম্ভিক, ভয়ানক অত্যাচারী। অতিরিক্ত উৎপীড়নে রোমের সম্ভ্রান্ত লোকেরা বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। ফলে টার্কিনকে রোম ত্যাগ করিয়া পলাইতে হইল। রোমের কর্তৃপক্ষ তখন ঠিক করিলেন যে, রোমে আর রাজা হইতে দেওয়া হইবে না। জনসাধারণের প্রতিনিধিরাই এখন হইতে রাজ্য শাসন করিবেন। এই ভাবে কিছুদিন বেশ সুশৃঙ্খলায় কার্য চলিয়া যাইতে লাগিল, নূতন ব্যবস্থায় সকলেই সুখী হইল। টার্কিনের সময়ের আইন-কানুন সব বদলানো হইল।

সহসা একদিন শোনা গেল, লার্‌স প্রোসেনা বহু সৈন্যসামন্ত লইয়া রোম আক্রমণ করিতে আসিতেছে। টার্কিন রোম হইতে বিতাড়িত হইয়া চুপ করিয়া বসিয়া ছিল না, ইক্রুরিয়ার রাজার শরণাপন্ন হইয়াছিল। ইক্রুরিয়ার রাজা রোমকে হিংসার চোখে দেখিত। রোমের শাসনাধীন কতকগুলি জনপদ সে পূর্বেই অধিকার করিয়া লইয়াছিল এবং রোমকে আপন রাজ্যের অধীন করিয়া ফেলিবার জন্য তাহার বড়ই আগ্রহ ছিল। অন্যান্য অনেক রাজাও রোমকে প্রীতির চক্ষে দেখিত না। ইক্রুরিয়ার রাজা রোম আক্রমণের একটা ছল খুঁজিতেছিল। এখন টার্কিন আশ্রয় লওয়ায় সে সহসা শরণাগত-বৎসল হইয়া উঠিল। সে নিজের সমস্ত সৈন্য তো একত্র করিলই, ইতালীর অন্যান্য রাজ্য

হইতেও বহু সৈন্য আনাইল। সমস্ত সৈন্য মিলাইয়া একটি বিরাট বাহিনী রচনা করিল।

রোমকগণ এই সংবাদ পাইয়া খুবই শঙ্কিত হইল সত্য, কিন্তু চুপ করিয়া বসিয়া রহিল না। তাহাদের সমস্ত শক্তি সম্মিলিত করিতে লাগিল। রোম নগরের বাহিরে রোমের যত প্রজা ছিল, তাহাদের সকলকে রোম নগরের মধ্যে আশ্রয় লইবার জন্য আদেশ দেওয়া হইল। দলে দলে প্রজারা চার-পাঁচ দিন ধরিয়া অনবরত রোমের মধ্যে আসিয়া আশ্রয় লইতে লাগিল।

একদিন সহসা দেখা গেল বন্যার মত সৈন্যশ্রেণী রোমের দিকে আসিতেছে, পথে যত গ্রাম পাইতেছে সব পুড়াইয়া ফেলিতেছে, দশদিক অন্ধকার করিয়া অগ্রসর হইতেছে। রোমের চারিপাশ প্রাচীর দিয়া ঘেরা। টাইবার নদীর উপর একটি কাঠের সেতু আছে, সেই সেতু দিয়া রোমে প্রবেশ করিতে হয়। রোমের জনতনেতারা দেখিলেন—এখন ঐ সেতুটি ভাঙ্গিয়া ফেলা ছাড়া আর উপায় নাই, কিন্তু সেতু ভাঙ্গিয়া ফেলিতে ফেলিতে শত্রুগণ আসিয়া পড়িবে। কোনরূপে সৈন্যগণকে যদি এক ঘণ্টাকাল বাধা দেওয়া যায়, তাহা হইলে সেতুটি অনায়াসে ভাঙ্গিয়া ফেলা যায়।

রোম নগরে হাহাকার পড়িয়া গেল। এমন সময়ে হোরেসিয়াস্ নামক একজন বীর বলিলেন—"আমি সেতুর মুখে দাঁড়িয়ে সৈন্যদের গতি রোধ করব, আমার আর দুজনকে সঙ্গে চাই। আমরা তিন জনে সঙ্কীর্ণ পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে থাকলে কেউ অগ্রসর হতে পারবে না। তখন অনায়াসে সেতুটি ভেঙ্গে ফেলা যাবে।"

দুইজন সহযোগী তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া গেল। তখন তিনজনে সেতুর মুখে তরবারি হাতে দাঁড়াইলেন। শত্রুপক্ষের তিনজনের বেশী সৈনিকের একসঙ্গে সঙ্কীর্ণ পথে অগ্রসর হইবার উপায় নাই। তিন-তিনজন করিয়া সর্বাপেক্ষা সাহসী ও বলবান বীরগণ অগ্রসর হইতে লাগিল, হোরেসিয়াস্ ও তাঁহার সঙ্গিদ্বয় তাহাদিগকে বধ করিতে লাগিলেন। এইরূপ শত্রুপক্ষের অনেকগুলি বীর তিনজন রোমক-বীরের অসির আঘাতে ধরাশায়ী হইল। ইতিমধ্যে সেতুটি প্রায় ভাঙ্গিয়া ফেলা হইল। রোমকগণ প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়া কাঠের থামগুলি কাটিয়া ফেলিল।

যখন সেতুটি পড়-পড়, তখন রোমকগণ বীর তিনজনকে চলিয়া আসিতে বলিল। হোরেসিয়াসের সঙ্গী দুইজন লাফ দিয়া সেতুর পরপারে চলিয়া আসিলেন। হোরেসিয়াস আসিলেন না; সেতুটি যখন সম্পূর্ণরূপে টাইবার নদীর জলে ভাসিয়া গেল, তখন তিনি টাইবারের জলে ঝাঁপ দিলেন।

হোরেসিয়াস্ প্রচণ্ড আঘাত পাইলেন; তাঁহার সর্বাঙ্গ বর্মে ঢাকা ছিল, অনেকক্ষণ যুদ্ধ করিয়া ক্লান্তও হইয়াছিলেন। টাইবারের জলে সাঁতার দিতে না পারিয়া তিনি ডুবিয়া গেলেন, কিছু পরেই আবার ভাসিয়া উঠিলেন। এইরূপে ভাসিতে ভাসিতে হোরেসিয়াস্ রোমের তীরে উঠিলেন। তখন শত্রুমিত্র সকলেই আনন্দে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। রোমকগণ দলে দলে আসিয়া তাঁহাকে কাঁধে করিয়া লইয়া গেল।

এইরূপে হোরেসিয়াস্ আর দুইজন মাত্র বীর অসংখ্য শত্রু সৈন্যের গতি রোধ করিয়া রোমকগণকে বাঁচাইয়া দিলেন।

———

বৃক্ষের সাক্ষ্য

এক গ্রামে বেচারাম ও কেনারাম নামে দুই বন্ধু বাস করিত, তাহাদের মধ্যে খুব ভাব ছিল। পরস্পরের প্রতি পরস্পরের অগাধ বিশ্বাস, কখনও কোন অবিশ্বাসের কারণ ঘটে নাই।

একবার বেচারাম তীর্থভ্রমণে যাইবার সময়ে বন্ধু কেনারামের কাছে কতকগুলি সোনার গহনা রাখিয়া গেল। বাড়ীর নিকটে পুকুরের ধারে একটি বটগাছতলায় বসিয়া বেচারাম গহনার বাক্সটি খুলিয়া কি কি গহনা থাকিল, কেনারামকে দেখাইয়া একটি তালিকা করিয়া বাক্সের মধ্যে রাখিল,—আর একটি তালিকা নিজের সঙ্গে লইল।

কেনারাম বলিল—"আমি একটা রসিদ দিই তবে? বাড়ীর মধ্য থেকে একটা দোয়াত কলম নিয়ে আসি?"

বেচারাম বলিল—"পাগল নাকি! তোমার কাছ থেকে আবার রসিদ নেব? রসিদ আবার কি হ'বে? তা ছাড়া কোথায় কোথায় ঘুরব, রসিদ হারিয়ে ফেলব রে ভাই।"

কেনারাম আর পীড়াপীড়ি করিল না, একবার পকেটে হাত দিল, যদি পেনসিল একটা পাওয়া যায়।

বেচারাম তীর্থভ্রমণ শেষ করিয়া বাড়ী ফিরিয়া কেনারামের কাছে গহনার বাক্সটি চাহিল।

কেনারাম বলিল—"গহনার বাক্স? সে আবার কি? গহনার বাক্স আমার কাছে কবে আবার রাখলে? গাঁজা

খেয়েছ নাকি ? না, তীর্থে গিয়ে তোমার মতিভ্রংশ হয়েছে। বাহাত্তর হ'তে তো এখনও ঢের বাকি।"

বেচারাম আকাশ হইতে পড়িল, বলিল—"বল কি বন্ধু ? তোমার কাছে যে যাবার আগের দিন সন্ধ্যার সময়ে ঐ বটতলায় গহনার বাক্স দিয়ে গেলাম। কি কি গহনা থাকল, তার এই তালিকা আমার কাছে রয়েছে। না, তুমি ঠাট্টা করছ, যাও, আর ঠাট্টা করতে হবে না। বাড়ীর ভিতর থেকে বাক্সটা আন দেখি।"

কেনারাম—কি আবোল-তাবোল বকৃছ ! গহনার বাক্স তুমি তোমার শ্বশুরবাড়ীতে রেখেছ, এখন বিলকুল ভুলে গেছ। তুমি রাখতে চেয়েছিলে বটে, আমি বল্‌লাম, 'না ভাই, অত টাকার জিনিস আমি রাখতে পারব না। বড় দায়িত্ব !' তুমি বললে যে, শ্বশুরবাড়ীতেই রেখে আসি তবে। কেমন ? এখন মনে পড়ছে ত ?

বেচারাম—এত বড় শঠতা ? তুমি এত বড় জোচ্চোর তা কখনও জানতাম না। তুমি বন্ধু হয়ে আমাকে পথে বসালে ? আচ্ছা আদালত আছে, দেখে নেব।

কেনারাম—তা নিও। একবার আদালতে গিয়ে দেখ না, তোমাকে পাগলা-গারদে পুরবে। না আছে সাক্ষী, না আছে রসিদ। ভয় দেখাচ্ছ ? দেখাও, তোমার রসিদ কিংবা যে কোন কাগজ, আমি এখনি যেমন করে পারি, যোগাড় করে দেব।

বেচারাম আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিল। হাকিম দুইজনকেই তলব করিলেন। কেনারাম মুচ্‌কি মুচ্‌কি

হাসিতেছে। বেচারামের মুখ বিষণ্ণ, হাকিম কি বিচার করিবেন কে জানে? হাকিম বলিলেন—

"আচ্ছা বেচারাম,—তোমার কাছে কোন রসিদ বা এক টুক্‌রো কাগজে সামান্য একটা কিছু লেখাও নেই?"

বেচারাম—হুজুর, গহনার তালিকাটা আছে।

হাকিম—একটা বালকও সেখানে ছিল না?

বেচারাম—আজ্ঞে না, সন্ধ্যার সময়ে একটা বটগাছতলায় বাক্সটা রাখতে দিয়েছিলাম।

হাকিম—বটগাছটাই তোমার একমাত্র সাক্ষী, কি বল?

সকলে হাসিতে লাগিল, কেনারামও যোগ দিল।

হাকিম—তবে, বেচারাম, সেই বটগাছটাকেই ডাক'!

আদালতে আবার হাসির রোল উঠিল, কেনারামের হাসি আর ধরে না।

হাকিম—আমি বল্‌ছি, সে আসবে। আমার নাম ক'রে ডাকবে। এ মুলুকের গাছগুলাও আমার কথা শোনে। যদি না-ও আসে; গাছের ভিতর হ'তে কথা শুন্‌তে পাবে। ফিরে এসে গাছ কি বলে জানাবে।

হাকিমের হুকুমে অনিচ্ছাতেও বেচারাম উঠিল এবং আস্তে আস্তে হতাশ হইয়া বাড়ীর দিকেই চলিল।

আধঘণ্টা কাটিয়া গেল। বেচারাম ফিরিয়া আসিল না। হাকিম বলিলেন, "লোকটা এখনও ফেরে না কেন?" আবার ২।৪ মিনিট বাদে কেনারামের পানে চাহিয়া বলিলেন—"এখনও ফির্‌লনা কেন? স'রে পড়্‌ল নাকি?"

কেনারাম হঠাৎ বলিয়া উঠিল—'আজ্ঞে, সে গাছ এখান

হ'তে চার পাঁচ মাইল দূরে। ফিরবার সময় হয়নি।"

হাকিম একজন পিয়াদাকে বলিলেন—"ঐ লোকটাকে গেরেফ্‌তার কর। আর বেচারামকে ফিরিয়ে নিয়ে এস।"

হাকিম কেনারামকে বলিল "শয়তান! যে গাছতলায় গহনার বাক্স নিয়েছিলে সে গাছটা চেন, আর গহনার বাক্সটির কথা জান না!"

কেনারাম কাঁদিয়া ফেলিল। হাতজোড় করিয়া বলিল, "হুজুর, মাফ করুন। ছেড়ে দিন, আমি এখনি বেচারামকে গহনার বাক্স ফেরৎ দিচ্ছি। বুঝলাম—ধর্মের কল বাতাসে নড়ে।" বলা বাহুল্য, হাকিম কেনারামকে ছাড়িলেন না।

ڈاکٹر عبدالقادر